মহানির্ব্বাণ

নন্দগোপাল সেনগুপ্ত

বিশ্বনাথ পাবলিশিং হাউস
৮, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা

প্রকাশক
শ্রীতুলসীচরণ ভট্টাচার্য্য
৮, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

মূল্য দুই টাকা

প্রিণ্টার—শ্রীমণীন্দ্রনাথ রায়,
মণ্ডল প্রেস
২৩, ডিক্সন লেন,
কলিকাতা।

প্রভা সেনগুপ্ত

স্থচরিতাস্থ

১০ চৈত্র, ১৩৫১

ন. সে.

মহানির্ব্বাণ

আটমাসের বিবাহিত জীবনে স্থলতা এই প্রথম অনুভব করলো যে সংসারকে সে ঠিক যে রকম মনে করেছিল, সংসার আসলে তা নয়। তার একটা সঙ্গত আব্দার পর্য্যন্ত সে বজায় রাখতে পারলো না, আর কারু কাছে নয়, তার স্বামীর কাছেই। সামান্য কিছু টাকার জন্যে তিনি তার প্রতি অশোভন রূঢ়তা করতে এতটুকু কুণ্ঠিত হলেন না।

স্থলতাদের গাড়ী-বারান্দার নীচে ক'দিন থেকেই একদল আশ্রয়হীন অন্নহীন নরনারী আস্তানা পেতেছে, সারাদিন তারা এদিক ওদিক চেয়ে-চিন্তে বেড়ায়, রাত্রে গাদাগাদি করে শুয়ে পড়ে থাকে—ঝগড়া-ঝাঁটি কান্নাকাটিতে পাড়া মাৎ করে তোলে। স্থলতা চেয়েছিল, এদের জন্যে কোন রকম ব্যবস্থা করা হয়।

ব্যবস্থার পরিকল্পনাও তার তৈরী ছিল। সামনের যে প্রকাণ্ড মাঠটা ভুলু পালদের নিলামে কেনা হয়েছিল, সেখানে বড় বড় দুটো চালাঘর তুলে দেওয়া হবে—একটা মেয়েদের জন্যে, আর একটা পুরুষদের জন্যে এবং বিনা ব্যয়ে তাদের দু'বেলা দুটো খেতে দেওয়া হবে। সেই সঙ্গে কয়েকটা অস্থায়ী শৌচাগার, নলকূপ, আর একটা ডাক্তারখানা বসানো হবে। আর কাপড়-চোপড় কিছু। বিখ্যাত হাজরা বাড়ীর একমাত্র আদরের বৌ সে—শ্বশুরের টাকার গতি-গঙ্গা নেই, স্থলতা তাই আশা করেছিল, এটুকু দাবী তার পূরণ হতে দেরী হবে না। চাই কি, এজন্যে শ্বশুরবাড়ীর সকলের প্রশংসা এবং স্বামীর আন্তরিক সহযোগিতাই সে পাবে।

কিন্তু আশ্চর্য্য। স্বামীর কাছে কথা তুলতেই এমন জোর ধাক্কা দিলেন তিনি যে আর দ্বিতীয় ব্যক্তির কাছে মুখ খোলারই সাহস হল না তার।

সুপ্রতিম বললেন, তুমি পাগল হয়েছো! দেশজোড়া এই অন্নাভাব —একে কখনো মুষ্টি ভিক্ষে দিয়ে ঠেকানো যায়? আর যে ফর্দ্দ তুমি ফেঁদেছো, তার জন্যে কত টাকা লাগে তাও কি একবার হিসাব করে দেখেছো?

সুলতা চুপ করে রইলো। সুপ্রতিম বললেন, অন্যে কষ্ট পাচ্ছে দেখলে দুঃখ হয় সবারই এবং দয়া করতে পারলে, তাও ভালোই—কিন্তু অসম্ভবের সঙ্গে যুদ্ধ করে লাভ কি?

সুলতা খুব বড় মুখ করেই কথাটা পেড়েছিল—এ রকম খাড়া অস্বীকৃতির জন্যে সে প্রস্তুত ছিল না। আহত কণ্ঠে সে বললো, সকলকে বাঁচানো হয়ত কঠিন, কিন্তু কতকগুলো লোককেও কি বাচানো যায় না? সেটাই বা কম লাভ কি?"

সুপ্রতিম কপাল কুঁচকে বললেন, লাভ? কি লাভ বলো ত শুনি? এই লোকগুলো যদি খেয়ে দেয়ে টিঁকে থাকে, তাহলে দেশের কোন মহৎ কাজটা এদের দিয়ে হবে?

সুলতা বললে, মহৎ কাজ হয়ত হবে না, কিন্তু ছোট কাজের জন্যেও ত লোক দরকার—এরা তাই করবে। এরা যদি না খেয়ে মরে যায়, তাহলে তোমরা কি লাঙল ধরবে, না নৌকা বাইবে, না জাল ফেলবে?

সুপ্রতিম একটু হাসলেন। বললেন, আমরা তা কোন দিনই করবো না—যা দিয়ে তা করানো যায়, তা আমাদের আছে বলেই লোকের অভাব হবে না। বাংলা মুল্লুকে যদি না মেলে, বেহার থেকে আনানো যাবে।

এবার সুলতা ধৈর্য্য হারালো। বললে, এই কি তোমার মতো শিক্ষিত লোকের কথা? তোমার টাকা আছে বলে যাদের তা নেই, তাদের তুমি মানুষ মনে করো না? সংসারে তাদের কোন দরকার নেই, সমাজে তাদের কোন অধিকার নেই?

সুপ্রতিম কিন্তু রাগও করলেন না, উত্তেজিতও হলেন না। ঈষৎ উপেক্ষার একটু হাসি মুখে জাগিয়ে রেখেই বললেন, কি করবো বলো? হরিণের দৃষ্টি নিয়ে বাঘের বিচার করলে ত চলবে না—বাঘ যখন রয়েছে, তখন তার দৃষ্টিকেও সমান ভাবেই স্বীকার করতে হবে ত!

সুলতা কর্কশ কণ্ঠে বললো, "কিন্তু বাঘের দিন ফুরিয়ে এসেছে—শিকারীরা ঘেরাও করে ফেলেছে চারিদিক থেকে, সে খবর পাওনি বোধ করি!

সুপ্রতিমের সেই অচল অনুত্তেজিত ভাব। বললেন, বেশ ত! বাঘের বংশ যদি নির্ম্মূলই হয়ে যায়, আর হরিণ, ছাগল, গাধাদের হাতেই যদি চলে যায় সব ক্ষমতা, তাহলে ত মিটেই যাবে। কিন্তু যতদিন তা না হচ্ছে, ততদিন ত শুধু প্রবন্ধ লিখে আর বক্তৃতা হাঁকিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হবে লতা। সেই চেষ্টাই করোগে বরং, প্রচুর সাহায্য পাবে আমার কাছ থেকে।

সুলতা আর কিছু বললো না, মুখে খানিকক্ষণ যুক্তিতর্ক চালালেও ভেতরটা তার পুড়ে যাচ্ছিল আহত আত্মাভিমানে। ইস, এত অসহায় আর অক্ষম সে! এত পরনির্ভরশীল মেয়েমানুষের জীবন! তার কান্না আসতে লাগলো। প্রাণপণে উদ্গত অশ্রু রোধ করে সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

সুপ্রতিমের মুখটা আরো একটু প্রসারিত হল একটা অস্পষ্ট ক্রুর হাসিতে।

বারান্দা থেকে সুলতা দেখলো, সুদেবের ঘরে আলো জ্বলছে এবং সুদেব টেবিলে মাথা রেখে কি একটা বইয়ের পাতা উল্টাচ্ছে নির্লিপ্ত আলস্যের সঙ্গে। আস্তে আস্তে ঢুকলো সে। মুখ-চোখ যথাসম্ভব স্বাভাবিক করে ডাকলো, ঠাকুরপো!

সুদেব খাড়া হয়ে উঠে বসলো, তারপর অল্প একটু হেসে বললো,

এসো বৌদি। আমার বন্ধু প্রকাশের লেখা এই নভেলটা পড়ছি, বেশ লিখেছে কিন্তু।

সুলতা বললে, শেষ হ'লে দিও আমাকে।

সুদেব বললে, দেব—কিন্তু তোমার কি ভালো লাগবে? এ একেবারে কম্যুনিজম-এর কচকচিতে বোঝাই। বেচারা দেখেছে অনেক, ভেবেছেও অনেক—চমৎকার!

এবার সুলতার যেন বুকে একটু বল এলো, সে বললে, আচ্ছা ঠাকুরপো, কম্যুনিজম-এ তুমি বিশ্বাস করো? মনে করো কি যে এদেশের ও-ছাড়া মুক্তি নেই?

—কে না করে?

—তোমার দাদা কিন্তু করেন না।

—দাদার সঙ্গে কোনদিনই আমার বনে না তাই। টাকার ধান্দায় মাথা খাটিয়ে খাটিয়ে এমন হয়েছে যে এখন তিনি টাকা ছাড়া অন্য কোন জিনিষ ভাবতেই পারেন না।

ঠিক সুলতার প্রাণের কথা। বিয়ের পর থেকে পুরো আট মাস সে এই লোকটির সঙ্গে ঘর করেছে, ভালোবাসা এবং মমতা পেয়েছে ঠিকই তাঁর কাছ থেকে, কিন্তু তবু যেন কোথায় একটা জায়গা ছিল, যেখানে সে স্বামীকে একদম চিনতে পারে নি। সেই অদৃশ্য জায়গাটা যে টাকা ঘটিত, তার পরিচয় সে পেয়েছে আজই। সুদেবের কথা তাই তার কানে বাজতে লাগলো আপন কথার প্রতিধ্বনির মতো। বুঝলো, ঠাকুরপোর সঙ্গে পরামর্শ করলে একটা সুরাহা হলেও হতে পারে।

সুদেব সব কথা স্থির ধৈর্য্যের সঙ্গে শুনলো। তারপর বললো, আমার ত কোন অমত নেই বৌদি, কিন্তু জানো ত আমার টাকা নেই। টাকা বাবার হাতে, আর বাবা ওঠেন বসেন দাদার কথায়।

সুলতা বললো, আচ্ছা আমার ত অন্তত হাজার দশেক টাকার

গয়না আছে। যদি আমি তোমার হাতে দিই, তুমি লুকিয়ে বিক্রী করতে পারবে না? তা ছাড়া নগদেও হাজার তিনেক টাকা তোমার দাদা আমায় দিয়েছেন—কাছেই আছে!

সুদেব খানিকটা ভাবলো, তারপর বললো, কিন্তু এ আর ক'দিন চাপা থাকবে বৌদি? যেদিন ওঁরা টের পাবেন যে আমি এই ষড়যন্ত্রের ভেতর আছি···

বাধা দিয়া সুলতা বললো, কিছু হবে না ঠাকুরপো। গয়না ত আমার বাবার দেওয়া, শুধু ঐ টাকাটা ওঁদের। তা ছাড়া কাজ একবার আরম্ভ হয়ে গেলে, তখন রাগই করুন, আর যাই করুন, ফেলতে পারবেন না। মানের দায়েই ওঁদের জিনিষটা টেনে যেতে হবে।

কথাটা সুদেবের অসঙ্গত মনে হল না। বিশেষত তার ভরসা আছে মার ওপরে, দাদার কৃপণতা ও গোঁর্ত্তুমির ভয়েই তিনি মুখ খোলেন না, কিন্তু একবার তাতাতে পারলে, আর তাঁকে রোখার সাধ্য নেই কারুর—দাদার ত নয়ই, বাবা পর্য্যন্ত টুঁ শব্দ করতে সাহস পান না। সুদেব বললে, আচ্ছা বৌদি তাই হবে। কিন্তু আমি ত একা পারবো না—এজন্যে ঢের লোক দরকার। এই যে প্রকাশ—এর মস্ত একটা দল আছে, তাদের সঙ্গে পরামর্শ করি। ওরা হয় ত চেষ্টা করলে চাঁদাও তুলতে পারবে অনেক টাকা।"

সুলতা প্রসন্ন হল। সুদেবের একটা হাত চেপে ধরে সে আবেগের সঙ্গে বললে, সত্যি ভাই ঠাকুরপো, তুমি খুব ভালো। তোমার দাদা আজ বড্ড কষ্ট দিয়েছেন আমাকে, এমন রূঢ়তা করেছেন!

ইতিমধ্যে বারান্দায় দাদার কণ্ঠস্বর শোনা গেল। তিনি ধমকাচ্ছেন চাকরকে, কি একটা কাগজ নাকি টেবিল থেকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। সুলতা তাড়াতাড়ি উপন্যাসটার পাতা উল্টাতে সুরু করে দিলে, আর সুদেব উঠে ইলেক্ট্রিক ষ্টোভ বরিয়ে কফি বানাতে বসে গেল। দাদা

বারান্দা পার হয়ে গেলেন। যাবার সময় জানালা দিয়ে বলে গেলেন, দেবু, দুটো আলো এক সঙ্গে জলছে কেন? নিভিয়ে দে একটা।

তিনটি ছেলে আর গুটি দুয়েক মেয়ে দিন দুই পরে এসে রায় বাহাদুরকে ধরেছে, তাঁর সদ্য কেনা ভুলু পালের মাঠটা তাদের সাময়িক ভাবে অন্নসত্র খোলার জন্যে দিতে হবে। তারা ওখানে কয়েকটা চালা তুলে দুস্থদের আশ্রয় দেবে এবং খাওয়াবে।

রায় বাহাদুর চশমার ফাঁকে তাদের দিকে বক্রদৃষ্টিতে তাকালেন একবার, তারপর বললেন, অন্নসত্র খুলবে, তোমরা কারা?

—আজ্ঞে আমরা একটি রাজনীতিক দল।

—তা ত বুঝলাম, কিছু টাকা-পয়সা আছে তোমাদের?

একটি মেয়ে বললে, আমাদের নিজেদের নেই, পাঁচজন দয়া করে দিয়েছেন আমাদের হাতে কিছু টাকা, তাই দিয়ে···

থামিয়ে দিয়ে রায় বাহাদুর বললেন, কত?

একটি ছেলে বললে, হাজার কুড়ি। এই নিয়ে আমরা কাজ সুরু করে দোব, এদিকে চতুর্দ্দিকে আমাদের কর্ম্মীরা বেরিয়েছেন, তাঁরা সংগ্রহ করতে পারবেন।

রায় বাহাদুর হোহো করে হেসে উঠলেন, বললেন, টাকা যারা রোজগার করে, তারা জানে কি ভাবে টাকা আসে। তোমাদের তা জানার কথা নয়। বিশ হাজার টাকায় তোমরা কলোনি বানাবে, আবার এই হাঘরের পালকে খাওয়াবে। হো হো হো!

আগেকার মেয়েটি আবার বললো, আজ্ঞে না, বিশ হাজার আমাদের আপাতত পুঁজি, তবে আমরা আরো প্রায় পঞ্চাশ হাজারের প্রতিশ্রুতি পেয়েছি। তা ছাড়া চাল-ডাল ইত্যাদি আমাদের জোগানোর ভার নিয়েছেন একজন বড় মহাজন।

—কে সেই বুদ্ধিমান?

—নাম বলতে বারণ আছে আমাদের।

রায় বাহাদুর ভ্রূভঙ্গ করে বললেন, দান করবে, আবার নামও চাইবে না, এমন মহাপুরুষ! বলো কি হে? দুনিয়া দেখছি আগা-গোড়াই বদলে গেছে!

একটু থেমে থেকে আবার বললেন তিনি, যাকগে, দেখো বাপু, জায়গাটা তোমরা ব্যবহার করতে পারো, পড়েই ত আছে। তবে মস্ত একটা ব্যাপার ফাঁদিয়ে ফেলে, তারপর তাল সামলাতে না পেরে যে আমার কাছে টাকার জন্যে এসে দাঁড়াবে, তা হবে না কিন্তু। তা ছাড়া যেদিন দেখবো, এই সব লক্ষ্মীছাড়ার উপদ্রবে পাড়ার স্বাস্থ্য নষ্ট হচ্ছে, সেই দিনই আমি কিন্তু পুলিসের সাহায্যে সব ঝেঁটিয়ে সাফ করে দোব।

ওরা এতেই রাজী। সেই মেয়েটিই বললে, আজ্ঞে জায়গাটা পেলেই আমাদের ঢের সাহায্য হবে, টাকা আপনাকে দিতে হবে না। আর যাতে পরিচ্ছন্নতার কোন ত্রুটি না হয়, সে দিকে লক্ষ্য রাখবার জন্যেও আমরা প্রাণপণ চেষ্টা করবো। কয়েকজন ডাক্তার আর নার্সের আমরা সাহায্য পেয়েছি, তাঁরা প্রতিদিনই আসবেন এবং দেখাশুনা করবেন।

রায় বাহাদুর বললেন, তবে আর কি? রামরাজত্ব এলো বললেই হয়।

ম্যানেজার খাতাপত্র নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন, মুখ তুলে তিনি বললেন, আচ্ছা, আপনারা এখন যেতে পারেন।

ছেলে মেয়েরা চলে গেল। রায় বাহাদুর মস্ত একটা অনুগ্রহ করেছেন, এমনি ধারা সগর্ব্ব হাসিতে মুখমণ্ডল উদ্‌ভাসিত করে বললেন, যতসব বদ-খেয়ালী ছেলে-মেয়ে জুটেছে! ওদের কি মা-বাপ নেই?

ম্যানেজার বললেন, কিন্তু স্যার বড়বাবু হয়ত রাগ করবেন।

রায় বাহাদুর বাধা দিয়ে বললেন, আরে না, না, ওতে আমাদের ক্ষতি ত কিছু নেই, বরং লাভই আছে। লোকে বুঝবে, জায়গাটা যখন আমাদের, তখন সদাব্রতটাও হয়ত আমাদেরই···মন্দ কি!

সুপ্রতিম ঢুকলেন ঘরে। তিনি সবই জানতে পেরেছেন, বিশেষ যে বিরক্ত হয়েছেন, তা মনে হল না তাঁর ভাবগতিক দেখে। ম্যানেজারকে তিনি ব্যবসায় সংক্রান্ত কয়েকটা ফাইল দিয়ে বললেন, হিসাবে কিছু কিছু ভুল হয়েছে দেখলাম, ভালো করে চেক করে নেবেন। আর হ্যাঁ, সেই গোলাম হোসেন ব্রাদার্সের চেকটা ক্যাস হয়েছে?

প্রকাশদের অন্নসত্র খোলা হয়েছে। প্রতিদিন সকাল দশটা থেকে বেলা তিনটে পর্য্যন্ত পাঁচ হাজার দুঃস্থ নরনারীকে তারা খিচুড়ী খাওয়াচ্ছে, প্রায় তিন হাজার গৃহহীন অসহায় নরনারীকে অস্থায়ীভাবে তারা আশ্রয়ও দিয়েছে। উঁচু ইটের প্রাচীরে ঘেরা ভুলুপালের মাঠ, তার ভেতর তারা কতকগুলি বড় বড় চালাঘর তুলেছে, কল বসিয়েছে, আলো এনেছে, চাকর, পাচক, ডাক্তার, নার্স, অনেক কিছু এনে হৈ-হৈ রৈ-রৈ কাণ্ড বাধিয়েছে।

কিন্তু সুলতা বা সুদেবের যেন ওদিকে ভ্রূক্ষেপই নেই। তারা ও-কথা তোলেই না, এমন কি কেউ তুললেও কেমন একটা বিরক্তির ভাব দেখায়। শুধু একটা জিনিষ বেশ নজরে পড়ে—আজকাল সুদেব আর সুলতায় দিনরাত্রি চুপি চুপি কি নিয়ে যেন সলা-পরামর্শ হয় এবং মাকেও সময় সময় সেই পরামর্শ-সভায় হাজির থাকতে দেখা যায়। জিনিষটা এত সাবধানতার সঙ্গেই হয় যে কেউ টের পায় না, এমন কি তীক্ষ্ণদৃষ্টি সুপ্রতিমও না।

হাজরা বাড়ীর বারান্দা এবং ছাদ থেকে কলোনির ভেতরটা

সবই দেখা যায়, বাড়ীর ছেলে-মেয়ে বৌ-ঝি অবসর মতো এই সব অন্নহীন আশ্রয়হীন নরনারীর দিকে তাকায়, আর যা-খুসী তাই মন্তব্য করে। সুদেবের এক দূর-সম্পর্কীয় মাসতুতো বোন থাকে এই বাড়ীতে। সেদিন দুপুরে সে সুলতার কাছে গিয়ে বলতে সুরু করলো, জানো বৌদি, এক একটা মাগী খাচ্ছে, যেন তিন তিনটে গোরুর সমান। ইস! আর এমনি বে-আব্রু হয়ে বসেছে যে তাকানো যায় না।

সুলতা গম্ভীর হয়ে শুনলো, তারপর বললো, দুঃখ হয় না তোমার ওদের জন্যে মেনু? কার দোষে ওরা এই অবস্থায় এসেছে?

কার দোষে? মেনু অবাক হয়ে গেল প্রশ্ন শুনে। কিন্তু ওদিকে মন দেবার মতো সময় এবং মেজাজ তার নয়। সে বললো, যাই বলো বৌদি, ওরা অতি অসভ্য—যা সব কাণ্ড করে রাত্রি বেলা! আমি স্বচক্ষে দেখেছি···

—কি দেখেছো?

বুঝি-বুঝি ভঙ্গীতে সুলতার কানের কাছে মুখ নামিয়ে এনে মেনু বললে, আজ ডাকবো তোমায় সন্ধ্যার সময়—এতটুকু টুকু মেয়ে, মাগো! কি না জানে তারা।

সুলতা এবার বিরক্ত হল। বললে, তোমার ওসব বিশ্রী কৌতূহল কেন মেনু? সমাজ যাদের আশ্রয় দিলে না, ভাত দিলে না, মানুষ করে তোলার দায়িত্ব নিলে না, তারা যদি সাধুপুরুষ না হয় ত' তাতে অন্যায় কিছু হয় না।

মেনু দমে গেল। বললে, জানি না বাপু! সবাই ত লুকিয়ে লুকিয়ে দেখে!

মেনু চলে গেল। একটু পরেই ঘরে ঢুকলো সুদেব। গায়ের কোটটা খুলতে খুলতে বললে, সর্ব্বনাশ হল বৌদি, ভীষণ কলেরা সুরু হয়েছে কলোনিতে—তিন দিনে প্রায় দু'শো লোক মরেছে, আরো

প্রায় তিনশো লোক ভুগছে। হরদম এম্বুলেন্স আসছে, আর নিয়ে নিয়ে যাচ্ছে !”

সুলতা বললো, ডাক্তার ··

–ডাক্তার কি করবে বৌদি? যে খাবার খাচ্ছে, তাতেই যে মরছে। ও কি মানুষের পেটে সয় কখনো? এক ভাগ চাল, আর তিন ভাগ ভুষি···ছোলা, মটর, ভুট্টা, কি নেই ওতে? তারপর জল, তারপর···

—অন্য কোন উপায় করা যায় না!

—ভেবে ত পাচ্ছি না। এদিকে বাবা ক্ষেপে আগুন হয়েছেন,–বলছেন, পাড়ায় মড়ক সুরু হবে। এখনি ভেঙে দোব সব।

—এবার আমাদের একটু শক্ত হতে হবে ঠাকুরপো।

—তাই ত ভাবনা বৌদি। আর যদি হাজার দশেক টাকা পায় ওরা, তাহলে হয়ত ছোট্ট একটা হাঁসপাতাল বসাতে পারে।

—“দশ হাজার? মাকে বলে দেখো না, হয় ত’ দিতেও পারেন তিনি।

সুদেব উদ্‌ভ্রান্তের মতো ছুটলো মা’র ঘরে। এদিকে আহার সেরে সুপ্রতিম এলেন দুপুরের বিশ্রাম করতে। সুলতা ফ্যানের জোরটা আর একটু বাড়িয়ে দিয়ে, বিছানাটা ঝেড়ে দিলে, তারপর বললে, বিকেলে কি বেরুবে কোথাও?

—না, আজ একটু লম্বা ঘুম দোব ভাবছি।

–কলোনিতে না কি ভীষণ কলেরা হচ্ছে?

—মরুক গে। আমাদের কি?

হঠাৎ প্রচণ্ড একটা হৈ-হৈ উঠলো। শিশুর চীৎকার, নারীর আর্ত্তনাদ, পুরুষের গর্জ্জন, তারি সঙ্গে প্রবল একটা সাঁই সাঁই শব্দ! সমস্ত পাড়া জুড়ে আওয়াজ উঠলো, আগুন, আগুন!

সুলতা ছুটে বেরুতে যাচ্ছিল ঘর থেকে—সুপ্রতিম হঠাৎ খপ করে তার হাত চেপে ধরলেন, বললেন, না সুলতা, অনেক অবাধ্যতা নিঃশব্দে সহ্য করেছি। এবার তোমায় আমার শাসন মানতে হবে।

সুলতা কেঁদে ককিয়ে উঠলো, ওগো, তোমার পায়ে পড়ি, আমায় ছেড়ে দাও—আমি দেখি কি হল হতভাগাদের।

সুপ্রতিমের সেই নিশ্চল নিরুদ্বিগ্ন ভাব। বললেন, কিছুই হয়নি—মানুষ নামে পরিচিত ভেড়ার পাল পুড়ে মরছে।

—পুড়ে মরছে ?

—হ্যাঁ, চারদিকে পাঁচীল, বাইরে থেকে দরজা বন্ধ, উপরে চালার ঘর, আর সমস্ত ইয়ার্ড গোগলা দিয়ে মোড়া। মরবে না ?

— দমকল···

—দমকলে খবর দিতে দিতে, আর তাদের আসতে আসতেই কাজ শেষ হয়ে যাবে !"

আর্ত্তনাদ, চীৎকার, কান্না ও হট্টগোল তখন চরমে উঠেছে। প্রাণের জন্যে মানুষের সেই অমানুষিক চীৎকার কানে যে না শুনেছে, তাকে বোঝানো যায় না। একটা সম্মিলিত শব্দ আসছে, বাঁচাও, বাঁচাও, পুড়ে মলাম, পুড়ে মলাম।

চতুর্দ্দিকের বাড়ীতে বাড়ীতেও উঠেছে তীব্র হাহাকার—সবাই হাঁকছে, দমকল, দমকল, জল, জল !

মা দৌড়ে এলেন। হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন তিনি, ওরে শীগগির দেখ—দেবু ছুটে গেল বুঝি আগুনের ভেতর।

সুপ্রতিম উঠে বসলেন, সুলতা এই অবসরে তাঁর হাত ছাড়িয়ে নিয়ে এক দৌড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

মা ডুকরে উঠলেন, গেল, বৌও গেল······সর্ব্বনাশ হল রে !

সুপ্রতিম বললেন, স্থির হয়ে বসো মা। দেখছি আমি। তারপর চটিতে পা দুটো গলিয়ে বেরিয়ে গেলেন তিনি।

* * * * *

দমকল এসেছিল, আগুনও নিভেছে। কিন্তু অন্নসত্রের অন্নার্থী অভাগারা তার আগেই আজন্মের ক্ষুধা থেকে চিরনিষ্কৃতি পেয়ে গেছে।

দেবু কাঁদতে কাঁদতে বললে, বৌদি!

সুলতা বললে, ঠাকুরপো এ কি হল!

কি আর বলবার আছে? গভীর সহানুভূতি আর মর্ম্মবেদনায় তারা পরস্পরের মুখের দিকে চেয়ে রইলো। নীচের ঘরে সুপ্রতিমের মুখেও ফুটে উঠলো একটা অর্থপূর্ণ ক্রূর হাসি—তাঁর বুদ্ধিকে কেউই ফাঁকি দিতে পারে না, কিন্তু তিনি সকলকেই আজ ফাঁকি দিয়েছেন! কোন কালেই কেউ পারবে না এর রহস্য ভেদ করতে!

অমৃতস্য পুত্রাঃ

ছেলেটাকে কাঁধে তুলে নিয়ে মেয়েটার হাত ধরে শিবু বললে, চল— আর দেরী করে কি হবে?

বিলাসী ডুকরে কেঁদে উঠলো। ন' বছরের মেয়ে বৌ হয়ে এসেছিল সে এই বাড়ীতে, আজ বয়স তার পঁচিশ—ছেলেপুলের মা, গিন্নীবান্নী হয়েছে। এতদিনের ঘরকন্না, এই ছেড়ে চলে যেতে হবে তাদের! কোথায় যাবে?

শিবু বললে, আঃ কেঁদে আর কি করবি? শুধু মাটি কামড়ে পড়ে থাকলে ত নিজেও বাঁচবি নে, ছেলেমেয়েগুলোও বাঁচবে না। তারচেয়ে বরং চল কলকাতায়—মস্ত জায়গা, কাজ-কারবারের অভাব নেই, একটা কিছু জুটে যাবেই।

বিলাসী বললে, আর কিছুদিন দেখলে হয় না?

কি করে দেখবি, শিবু বললে। যা ছিল ঘটি বাটি সিন্দুক তক্তপোষ সব ত বিকিয়ে গেছে; ভিটেটুকু, তাও বন্ধক। থাকার মধ্যে এখন আছিস তুই, আর আছে এই ছেলে-মেয়ে দুটো।

বিলাসী কি আর একথা জানে না? টুকিটাকি ক্ষেতখামারের কাজ করে, ঝুড়ি বুনে, তালপাতার পাখা বানিয়ে কোন রকমে যেতো তাদের দিন। এই আকালের মুখে কি আর তাতে অন্ন হয়? টাকায় এক সের চা'ল, তাও সবদিন মেলে না। পেটের দায়ে পাড়া-পড়শী সকলেই একে একে গাঁ-ছেড়ে পালিয়েছে কলকাতায়—ওরা এতদিন পর্য্যন্ত লড়েছে, কিন্তু আর চলছে না। আজ পাঁচদিন ভাত জোটে নি, ছেলে-মেয়ে দুটোকে কচুর শাক আর বেগুনপোড়া, ডালের খুদ আর চিটেগুড় খাইয়ে কোন রকমে টিঁকিয়ে রেখেছে। নিজেরা খেয়েছে। বড্ড বেশী

ক্ষিদে পেলে ত্ব' আঁজলা জল, আর সেই সঙ্গে হয় তুটো আমড়া, নয় এম্নি কিছু। এমন করে আর কদিন যায়? এখনি ত শরীর ঝিম ঝিম করছে··· মরণের আর দেরী কি?

কিন্তু তবু মাটির মায়া। বেচারী বিলাসী কেঁদে খুন হতে লাগলো। শেষটা শিবু চটে উঠলো। বললে, তবে মর নিজে—আমাকে মার, ছেলে-মেয়ে তুটোকেও মার।

বিলাসী নিজেকে সামলে নিয়ে দাওয়া থেকে উঠানে নামলো, তার পর আস্তে আস্তে শিবুর পিছনে এসে দাঁড়ালো।

যাত্রা স্থরু হল, নিরুদ্দেশযাত্রা। আরামডাঙার এলাকা শেষ করে মেটেরির পথে নেমেই শিবু ছেলেটাকে কাঁধ থেকে নামালো, তার পর পা ছড়িয়ে মাটিতে বসে পড়ে বললো, একটু জিরিয়ে নিই। পা যেন চলছে না।

বিলাসী তখনো ফোঁপাচ্ছে, আর বার বার পিছুফিরে তাকাচ্ছে। মাথার পুঁটলিটা নামিয়ে সেও বসলো।

শিবুরও মনটা কেমন যেন উদাস। বেশী কথা কয় না সে। শুধু বললে, এইখানেই গাঁয়ের সীমানা শেষ। কি গাঁ ই ছিল, আর কি হয়েছে!

পেনিটির বাজারে যখন তারা পৌঁছুলো, তখন সন্ধ্যে হয়ে গেছে। বেশ বড় বাজার, তখনো বিকিকিনি চলছে, লোকজনের মন্দ ভীড় নেই। বিলাসী আর হাঁটতে পারছে না, শিবুও কাতর হয়েছে, ছেলেমেয়ে তুটোত ক্ষিদেয় আর রোদে ধুঁকছে। .টলতে টলতে একটা মুড়ি-ওয়ালার দোকানের সাম্নে এসে দাঁড়ালো ওরা।

শুকনো গলায় শিবু বললে, কলকাতা আর কতদূর ভাই?

দোকানী কৃপার হাসি হেসে বললে, কলকাতা? সে এখনো চারদিনের পথ।

শিবু যেন হতাশায় একেবারেই ভেঙে পড়লো।

দোকানী বললে, কলকাতায় যাচ্ছো কোন কম্মে ?

—আর কোন কম্মে ? ভাতের ধান্দায় রে ভাই ! কোন কিছুতেই আর আসান হল না, মাগ-ছেলে নিয়ে তাই পথে ভেসেছি।

দোকানী বিজ্ঞের মত ঘাড় নেড়ে বললে, বুঝলাম। অনেকেই ত যাচ্ছে। তা রাতটা এখানে কাটিয়ে নাও, সকালে বরং সঙ্গী-সাথী জুটিয়ে দেওয়া যাবেখন।

কৃতজ্ঞ শিবু বললে, তাহলে বড় ভাল হয় ভাই।

দোকানী বদান্যতায় একেবারে বিগলিত হয়ে বললে, তা দুটো মুড়ি-মুড়কি খাও সবাই মিলে।

হাঁকডাক করে সে একটা বাচ্চা ছোঁড়াকে আনালো, বললে, হেবো একটু ঘোল টোল এনে দে ত বাপ। বিদেশী লোক, কারে পড়েছে, দুটো ফলার করে থাক।

শিবু বললে, পয়সা-কড়ি ত কিছু নেই দাদা। দয়া করে দুটো কিছু ছেলেমেয়ে দুটোকে দাও, আমরা আর কিছু খাবো না।

আহাহা, জিভ কেটে দোকানী বললে, পয়সাটাই কি সব রে ভাই ? মানুষ ত আমিও, দয়া-ধর্ম্ম বলে ত একটা জিনিষ আছে।

ফলার শেষ হল। সারাদিনের হাঁটুনি, তার সঙ্গে প্রচণ্ড ক্ষুধা-তৃষ্ণা—মন্দ লাগলো না ঘোল দিয়ে মুড়ি-মুড়কির ফলার। খেয়ে উঠে শিবু অনেকটা সুস্থ বোধ করলো। বিলাসীরও যেন ধড়ে প্রাণ এলো। ফিস ফিস করে শিবুকে বললে সে, দোকানী কিন্তু মানুষটা খুব ভালো। মহৎ লোক ভাল হক, বলে শিবু নড়েচড়ে বসলো।

দোকানী একটা লণ্ঠন হাতে এগিয়ে এসে দরজার বেড়াটা সরিয়ে দিলে। তার পর ঘরের ভেতরটা দেখিয়ে দিলে। বললে, শুয়ে পড়ো সব এইখানে। খালি ঘর পড়েই থাকে, কিচ্ছু অসুবিধা হবে না আমার।

ছেলেমেয়ে দুটো দৌড়ে গিয়ে চাটাইয়ের ওপর শুয়ে পড়লো। বিলাসীও শুতে পেলেই বাঁচে। খানিক ইতস্তত করে সেও ওদের পাশে কাত হয়ে শুলো।

শিবু বসে রইলো একা। এক রাত্রের জন্যেও আহার এবং আশ্রয় পেয়ে তার বুকে যেন একটু বল এসেছে। রাত পোহালেই সে পাবে দু'চারটি সঙ্গী-সাথী, তাদের সঙ্গে কথায় কথায় বেশ চলে যাবে, আর ভালোলোকেরও ত অভাব নেই দুনিয়ায়, দুটো দুটো খেতে দেবেই কেউ না কেউ। তার পর কলকাতায় পৌঁছুলে··· । আশার আকাশ-কুসুম গড়তে গড়তে কখন ঘুমিয়ে পড়েছে শিবু।

সারাদিনের ক্লান্তিতে মড়ার ঘুম ঘুমুচ্ছে সবাই। হঠাৎ শিবুর ঘুম ভেঙে গেল একটা গোঁ-গোঁ শব্দে, আর তারই সঙ্গে প্রচণ্ড একটা ধ্বস্তাধ্বস্তির আওয়াজে। ট্যাঁক থেকে দেশলাই নিয়ে ফস করে জ্বালিয়েই শিবু দেখে, কে একটা লোক মাথায় গামছা মুড়ি দিয়ে এসে বিলাসীকে ধরেছে, আর তার হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্যে বিলাসী করছে প্রাণপণ চেষ্টা। একটা কাপড় দিয়ে তার মুখটা শক্ত করে বাঁধা, তাই চেঁচাতে পারছে না, খালি গোঁ-গোঁ করছে।

দেশলাইয়ের কাঠি জ্বলে উঠতেই লোকটা বিলাসীকে ছেড়ে দিয়ে তড়াক করে উঠে পালালো। শিবু ততক্ষণে আর একটা দেশলাই কাঠি জ্বেলেছে।

বিলাসীর মুখটা খুলে দিতে সে উঠে বসলো। তখনো সে কাঁপছে ঠকঠক ক'রে। সর্ব্বাঙ্গ ঘামে ভিজে গেছে।

হাঁপাতে হাঁপাতে বললো সে, দোকানীটা।

কি করে বুঝলি, শিবু জিজ্ঞাসা করলে সন্দেহের সুরে।

বিলাসী বললে, দেশলাই খাড়ি জ্বলতেই মুখ দেখতে পেলাম। ডান হাতে দিয়েছি কামড়ে ঘা করে, দেখো কাল সকালে।

শিবু বললে, আর সকালে কাজ নেই। চল এখনি চলে যাই—বারোয়ারী তলায় থাকিগে বরং।

বিলাসীরও ইচ্ছা করছে এখুনি চলে যায়। কিন্তু শরীর তার ভেঙে পড়ছে ঘুম আর ক্লান্তিতে। বললে, কাজ নেই— একটু সবুর থেকো।

ভালো করে সকাল হবার আগেই ওরা এলো বারোয়ারিতলায়। প্রকাণ্ড নাট-মন্দিরের চারিদিকে প্রশস্ত বারান্দা, তারি একটাতে ছেলেমেয়ে দুটোকে আর বিলাসীকে বসিয়ে শিবু বললে, আমি একটু ঘুরে আসি। দেখি সহরের যাত্রী দু'একটা পাই কিনা।

বিলাসী বললে, খাবার-দাবার কিছু পাও কিনা দেখো। বাছাদের ত আর রাখা যায় না!

শিবু বেরিয়ে গেল।

ঘণ্টা তিনেক পরে ফিরে এসে শিবু দেখে, বারান্দা থেকে নেমে বিলাসী চাতালে আছে বসে আর তারি সামনে মেঝে পেঁচি নেতিয়ে পড়ে আছে পুঁটলিটা মাথায় দিয়ে। ছোট ছেলেটা কাঁকর কুড়িয়ে খেলা করছে।

শিবুকে দেখেই বিলাসী ডুকরে উঠলো,—সর্ব্বনাশ হয়েছে গো, পেঁচির আট-দশ বার পেট নামিয়েছে, আর বমি হচ্ছে। ওরা এসে বকেঝকে নামিয়ে দিলে রোয়াক থেকে। এখানেও থাকতে দিচ্ছিল না—অনেক হাতে-পায়ে ধরে তবে তুমি আসা পর্য্যন্ত থাকার ব্যবস্থা করেছি।

শিবুর পেট ঘুলিয়ে উঠলো, চোখে অন্ধকার দেখতে লাগলো সে। রোয়াক ধরে বসে পড়লো সে। দেখলে পেঁচী নিস্তেজ হয়ে পড়ে আছে—কঙ্কালসার বুক আর পাঁজর তার কাঁপছে ধুক ধুক করে। থেকে থেকে বমির ভাব হচ্ছে, তার সঙ্গে উঠছে প্রবল হিক্কা। কলেরা তাহলে?

নাট-মন্দির থেকে পুরোহিত বেরুচ্ছিলেন, দেখে বললেন, কি সর্ব্বনাশ! এখানে এই ঠাকুর-মন্দিরে তোরা কোত্থেকে এসে জুটেছিস? বেরো বেরো শীগগির!

বাবা গো, ককিয়ে উঠলো শিবু, মেয়েটার আমার ওলাউঠা হয়েছে। বাঁচাও গো বাবা।

ঠাকুর-মশায়ের মুখে ফুটে উঠলো অপার্থিব একটা আধ্যাত্মিকতার দ্যুতি। বললেন, ভগবান যাকে নিচ্ছেন, আমি তাকে বাঁচাবো? যা-যা এখান থেকে সরে পড়—এই দেবস্থানে মরলে এখন মহা বিভ্রাট!

কিন্তু বিভ্রাট হলে হবে কি? হঠাৎ প্রচণ্ড একটা দমক দিয়ে উঠতে চাইলো পেন্টি, তার পরই ভেঙে পড়লো হাত-পা টান করে। হয়ে গেল সব শেষ। বিলাসী চীৎকার করে উঠলো, শিবু ডাক ছেড়ে কাঁদতে লাগলো। শুধু দেড় বছরের অবোধ ছেলেটা তাকিয়ে রইল জুল জুল করে।

লোক জুটতে দেরী হল না। কেউ কেউ আহা বললে, কেউ বা বললে, কি দিনকালই হয়েছে! কিন্তু এ বিষয়ে কারুর দ্বিমত দেখা গেল না যে, এমন পুণ্যস্থানে মেয়েটাকে মরতে দেওয়া মহা অন্যায় হয়েছে ওদের।

যাই হোক, একটা ব্যবস্থা ত করতে হবে। হৈ-চৈ করে দুটো ডোম জোটালো তারা—গামছা জড়িয়ে তুলে নিয়ে গেল তারা পেন্টীকে। আর পুরোহিতের হুকুমে শিবুর পুঁটলী টান মেরে সড়কে ফেলে দিলে এক জন।

শিবু হাতজোড় করে বললে, দয়া কর গো বাবা, দয়া করো। গরীব আমি—একটু দাঁড়াতে দাও পায়ে।

দিলে না কেউ। ছেলেটাকে কাঁধে তুলে নিয়ে পুঁটলীটা হাতে শিবু এগিয়ে চললো—পিছু পিছু বুক চাপড়াতে চাপড়াতে চললো বিলাসী।

ভীড়ের ভেতর থেকে একটা ছোঁড়া আর একটাকে বললে, মাগীটা কিন্তু বেড়ে মাইরি!

কালুখালিতে পৌছুলো ওরা প্রায় সন্ধ্যে নাগাত। পেনেটির মতো নয়, তবু কালুখালিও বেশ জায়গা। হাট-বাজার আছে, লোকজনও অনেক।

একটি ভদ্রগোছের লোককে ধরে শিবু বললে, বাবা গো, দুটো খেতে দেবেন আমাদের?

লোকটা বিড়ি ফুঁকতে ফুঁকতে বললে, চা'লের দাম কত জানো? খেতে দেওয়া চাট্টিখানি কথা!

শিবুর প্রবৃত্তি হল না আর কিছু বলে। কিন্তু ক্ষুধার্ত্ত ছেলেটা কাঁধে বসে দাপাচ্ছে—দায়ে পড়েই বলতে হল, কি করবো বাবা? ঘরবাড়ী ছেড়ে পেটের তাগিদে বেরিয়েছি, পথে একটা মেয়ে মলো···

লোকটা কটাস করে বললে, ভালোই ত হল। এটাও মরলে একেবারে পাৎলে যাবে—তার পর মাগীকে কারুর হাতে গছিয়ে দিয়ে সরে পড়ো।

শিবু এগিয়ে চললো, পিছু পিছু বিলাসী।

ছিপ হাতে ফিরছিল একটি বছর কুড়ি-একুশের ছোকরা। শিবু তাকে ধরলো।

ছেলেটা বললে, এসো আমার সঙ্গে।

রাত্রের মতো আশ্রয় মিললো, আহারও মিললো। গিন্নীমা খুব অমায়িক মানুষ। ধৈর্য্যের সঙ্গে শুনলেন শিবুর সমস্ত কাহিনী। মেয়েটার মৃত্যুর কথা শুনে চোখে তাঁর জলও এলো একটু। বিলাসী কেমন যেন হয়ে গেছে, কথাও বলে না, নড়েও না, চলন্ত একটা নিষ্প্রাণ বোঝার মতো!

গিন্নীমা বললেন, মাথায় তেল দিয়ে চান কর দু'জনে—তারপর খাওয়া দাওয়া কর। কি আর করবি বল? মানুষের কি কষ্টই যে হয়েছে।

স্নান করে ও কয়েকদিন অর্দ্ধাশন অনশনের পর থালা-ভরা ভাত-তরকারি নিয়ে বসে বিলাসী অনুভব করলো, অপত্য-বিয়োগের মতো ভীষণ শোকেরও বোধ হয় শেষ আছে! একবার মনে হল তার, লোভী মেয়েটা

কি ভালোই বাসতো এটা-সেটা খেতে। অন্ধকার পথে তাকে চিরদিনের মতো বিসর্জন দিয়ে এসে, কোন প্রাণে সে খাচ্ছে!

আবার ভাবলো, হয় ত ভালোই হয়েছে [illegible] না খেয়ে মরতো, তার চেয়ে আগেই মুক্তি পেয়ে গেছে [illegible] চোখে [illegible] দিকে তাকিয়ে নিঃশব্দে খেতে লাগলো। দেড়-বছরের [illegible] পেয়ে আগেই ঘুমিয়ে গেছে। ওরাও তাড়াতাড়ি [illegible] শুয়ে পড়লো। পেট ভরে ভাত খাওয়া এবং ঘরে শোওয়া—জীবনে এ আজ কত দুর্লভ সম্পদ।

গিন্নী বলেছিলেন, দু-এক দিনের মধ্যেই পরিচিত মতো লোক পেলে তার সঙ্গে শিবুদের কলকাতায় পাঠিয়ে দেবেন—সেখানে তাঁর আত্মীয়স্বজন আছে, হয়ত বেচারাদের একটা কিনারা করা কঠিন হবে না। কিন্তু পরের দিন সকালেই প্রচণ্ড কম্প দিয়ে শিবুর জ্বর এলো—আর দুপুরের মধ্যেই হল সংজ্ঞালুপ্তি।

বিলাসী কাঁদতে কাঁদতে ছুটে এলো গিন্নীমার কাছে। বললে, মাগো, বাঁচাও আমায়। ভাঙা কপাল বুঝি আবার ভাঙে!

গিন্নী বললেন, ভয় নেই। হীরু আসুক—ব্যবস্থা করবে। ডাক্তারি পড়ছে সে, ওষুধপত্তর দেবে।

ভয়ে বিলাসীর হাত-পা কাঠ হয়ে আসছে। গলা শুকিয়ে যাচ্ছে থেকে থেকে। সমস্ত বিকেলটা সে অধীর হয়ে কাটালো একবার ঘর, একবার বাইরে করে।

হীরু এলো সন্ধ্যার সময়, দেখে-শুনে গম্ভীর হয়ে গেল। তারপর বিলাসীকে পাশের ঘরে ডেকে নিয়ে গিয়ে বললে—শোনো, ওর বিকার হয়েছে, খুব কঠিন অসুখ। তবে ভয় করো না, চিকিৎসা করছি আমি। সময় লাগবে সেরে উঠতে।

দিন পনেরো অজ্ঞান অচৈতন্য হয়ে জ্বরে পড়ে থেকে অবশেষে শিবু সেরে উঠলো।

গিন্নীমা ও দাদাবাবুর কাছে বিলাসীর আর কৃতজ্ঞতার শেষ নেই। শিবুকে সে একটু একটু করে সবই শোনালো। তার দারুণ অসুখের ভেতর কি ভাবে ওঁরা তাকে দেখাশোনা করেছেন, ওষুধপথ্য দিয়েছেন, দাদাবাবু কি রকম রাত্রে দু'বার তিনবার উঠে এসে এসে তার খোঁজ নিয়ে গেছেন, সবই। শিবু এখনো ভালো করে কিছু ভাবতে পারে না, তবে এটা বুঝেছে যে সে মানুষের আশ্রয়ে পড়েছে।

সেদিন সন্ধ্যার পর একটু-ঘুম একটু-জাগরণের ভেতর হঠাৎ শিবু বারান্দা থেকে একটা চাপা কথাবার্ত্তা শুনলো। যেন দাদাবাবু আর বিলাসীর কথা। সব বুঝতে পারলো না, তবে যতটা শুনলো তাতেই মনে হল তার যে আর এখানে থাকা উচিত নয়। এবার পথ দেখতে হয়।

একটু পরেই বিলাসী এলো। শিবু দেখলো তার মুখে পান, খোঁপাটাও একটু যত্ন করে বাঁধা হয়েছে! একটা নিষ্ফল আক্রোশে সে তাকালো তার দিকে, তার পরই বললে, কাল আমরা বেরিয়ে পড়বো।

বিলাসী বললে, এই শরীরে?

শিবু বললে, এটা আমার কোন বাপ-দাদার বাড়ী যে বসে বসে খাবো, আর শরীর সাব্যস্ত করবো? পথের কুকুর, পথেই পড়ে থাকবো—বড়লোকের আশ্রয়ে আমার কাজ কি?

বিলাসী প্রথমটা অবাক হয়ে গেল শিবুর এই অকারণ উষ্মা দেখে। তারপর সেও ঝেঁকে উঠলো, আছো মানুষের হিল্লেয়—এদের ধরে থাকতে পারলে শেষ পর্য্যন্ত হয়ত একটা কিনারাও হবে। তা সহ্য হচ্ছে না! যাবে কোন মক্কায় শুনি?

—যেখানে খুসী যাবো। তোর ইচ্ছে না হয়, তুই থাক এই ভালো মানুষের হিল্লেয়। খেতে পরতে পাবি—আরো যা চাইবি পাবি। আমি ওসবের মধ্যে নেই। আমি ছোঁড়াটাকে নিয়ে কালই রওনা হয়ে যাবো।

কলকাতায় পৌঁছে শিবু দেখলে, দূর থেকে সে যা ভেবে এসেছিল,

ব্যাপার মোটেই তেমনটি নয়। কাজ-কারবার, লোকজন, গাড়ী-ঘোড়ায় গম গম করছে সহর। ওদিকে তাকালেই ভয়ে শিবুর বুক শুকিয়ে যায় এর ভেতর কাকে ধরবে সে? কোথায় সে যাবে কাজের সন্ধানে? সমস্ত মানুষই চলেছে বোঁ বোঁ করে আপন-আপন তাল নিয়ে, কেউ কারুর জন্যে থেমে দাঁড়ায় না। গাঁয়ের মানুষ শিবু, সহুরে মানুষদের এই আত্মসর্ব্বস্বতায় তার কেমন যেন লাগে!

এদিকে পূরো এক দিন পেটে কিছু পড়ে নি। ছেলেটা টা টা করছে ক্ষিদের জ্বালায়—সুপালের এক দোকানী দয়া করে দিয়েছিল দুটি খৈ, মুড়কি, তাই খাইয়ে তাকে কলকাতা পর্য্যন্ত টেনে এনেছে স্বামী-স্ত্রীতে। কিন্তু আর ত রাখা যায় না—দুগ্ধহীন স্তন দুটো মুখে পুরে দিয়ে বিলাসী তাকে থামাতে চেষ্টা করে, কিন্তু ভাত-খাওয়া ছেলে, ওতে শান্ত হবে কেন? বিলাসী নিজেও আর পারে না—সব সময় তার মাথা ঘোরে, মনে হয় উঠে দাঁড়ালেই পড়ে যাবে। না খেয়ে আর ক'দিন থাকা যায়?

শ্যামবাজারের একটা ফুটপথে আরো অনেকের সঙ্গে শিবু আস্তানা পাতলো। এদিক-ওদিক ঘুরে দেখলো সে, হাজার হাজার স্ত্রী-পুরুষ এসেছে নানা জায়গা থেকে, ঠিক তাদেরই মতো অন্নের ধান্দায়। মেটে সানকীতে করে ফ্যান চেয়ে আনছে এবাড়ী সেবাড়ী থেকে—কদাচিৎ অতি কদর্য্য চেহারার খিচুড়ী জুটিয়ে আনছে কোথা থেকে—সবাই কাড়াকাড়ি করে তাই খাচ্ছে, আর ইতস্তত বাহ্যে-পেচ্ছাব করে ভাসিয়ে দিচ্ছে। স্নান নেই, ঘুম নেই, পরণে কাপড় নেই, তাতে দৃকপাত নেই—শুধু ভাত, আর ভাত!

ভয়ে হিম হয়ে আসে শিবুর হাত-পা। যদি কাজ-কর্ম্ম না জোটে, তাহলে তাকেও ত এই করতে হবে! এই অনাবৃত পথে পড়ে থাকতে হবে ঠিক ওদেরই মতো করে—এই রকম দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে বেড়াতে হবে! এই ফ্যান, আর ঐ খিচুড়ীতে কি বাচ্ছা ছেলেটা বাঁচবে ভাবতে ভাবতে কান্না এসে যায় শিবুর।

বিলাসী বিকেল পর্য্যন্ত চুপচাপ বসে রইলো—শেষে যখন সন্ধ্যা হয়ে আসে, তখনো পর্য্যন্ত শিবুকে নড়তে না দেখে বললো, সাধ মিটেছে এবার কলকাতায় আসার? কোথায় তোমার সাত ব্যাটা নয় নাতি আছে খুঁজে বের করো গে—আমি মরি তাতে দুঃখ নেই, ছেলেটাকে বাঁচাবে ত? না ওকেও মেয়েটার সঙ্গে দেবে?

বিলাসীর মুখে শিবু কোনদিন এ রকম কথা শোনে নি! ফ্যাল ফ্যাল করে তাকালো সে তার দিকে। তার পরে বললো, ব্যস্ত হস নে—দেখছি।

আর দেখছো, বলে বিলাসী চুপ করলো। ছেলেটা ইতিমধ্যে প্রবল কান্না জুড়ে দিয়েছে। ফুটপথের এক কোণায় শোন-পাঁপড়ী বিক্রী হচ্ছে, আর এক কোণায় আপেল, ন্যাসপাতি, ল্যাংড়া আম। ক্ষুধার্ত্ত শিশুর চোখ পড়েছে সেদিকে। ছিঁড়ে খাচ্ছে সে মাকে তার জন্যে। কাতর চোখে বিলাসী বার বার তাকালো জিনিসগুলোর দিকে—লোভ কি তারি হয় না? কিন্তু পয়সা? ছেলে বোঝে না—কান্না, ক্রমাগত কান্না, শেষে উত্যক্ত হয়ে দিলে বিলাসী তার পিঠে ঘা কতক বসিয়ে।

শিবু হাঁ হাঁ করে উঠলো, কি করিস? আক্কেল নেই একটু? না খেয়ে ধুঁকছে, তার ওপর ঐ দুধের বাচ্ছাকে তুই মারিস?

তা কি আর বিলাসীই জানে না! কিন্তু কি করবে সে?

শিবু সসঙ্কোচে এগিয়ে গেল ফলওয়ালার কাছে। আমতা আমতা করে বললে, ও ভাই শুনছো! একটা কিছু দেবে দয়া করে? ন্যাংলা ছেলেটা ধরেছে—

ফলওয়ালা মাতব্বরী হাসি হেসে বললে, হাঁ হাঁ, তা দিবে বৈকি! শালা, ভাত খাইতে পায় না, আউর ফল মাংতে আইসে!

শিবু ফিরলো শোন-পাঁপড়ীওয়ালার দিকে। সে আর এক পর্দ্দা সুর চড়িয়ে বললে, মরে যাইরে সোনার চাঁদ আমার! শোন-পাঁপড়ী খাবে

—দুদিন পরে কলা পাবে তার ঠিক আছে? যত পাপ এসে জুটেছে কলকাতায়!

ফিরে এসে দেখলে শিবু ক্ষুধার্ত্ত ছেলেটা মাটিতেই কেঁদে কেঁদে ঘুমিয়ে গেছে, আর তাকে আগলে দু'হাতে মাথা চেপে ধরে বসে আছে বিলাসী।

শিবু বললে, ঐ সামনের বাড়ীগুলোতে একবার দেখিগে পয়া দিয়ে দেয় কি না, কিছু।

বিলাসী বললে, হ্যাঁ, যাও, ভাঁড় ভরে দেবে।

শিবু চলে গেল।

ফ্যান, আমানি, পান্ত-কড়কড়ে ভাত, খিচুড়ী···যেদিন যা জুটছে, তাই এনে শিবু লালমোহন আর বিলাসীকে খাওয়াচ্ছে, নিজেও খাচ্ছে। বিলাসী সেই যে এসে ফুটপথে বসেছে, সেখান থেকে আর নড়ে নি—একবার উঠে হয়ত রাস্তার কলে মুখ ধোয়, নয়ত মাথায় খানিক জল থাবড়ে দেয়, আর বড় জোর ছেলেটাকে কোলে নিয়ে ফুটপাথের আর এক মুড়োয় গিয়ে দাঁড়ায়। আর সব মেয়েই ভিক্ষায় বেরোয়, বিলাসীকে শিবু কিছুতেই রাজী করাতে পারে না।

শিবু একাই অলিগলি চষে বেড়ায়। সকালে বেরোয়, বেলা দুটো তিনটে পর্য্যন্ত ঘুরে কোনদিন কিছু জোটে, কোন দিন কিছু না। পথে সে দেখে, কোন কোন জায়গায় নর্দ্দমা ঘাঁটকে লোকেরা এটা-সেটা তুলছে, আর জন্তুর মতো গব গব করে মুখে পুরছে। দেখে ভয়ে আর ঘৃণায় শরীর তার শিউরে ওঠে। একদিন দেখলে, একটা লোক বমি করে গেল—আর একটা লোক সেই বমির ভাত কুড়িয়ে নিয়ে চাপা কলে ধুতে লাগলো। এর পর শিবু আর দাঁড়াতে পারলো না, মাথা ঘুরে পড়ে গেল ফুটপথের ওপর। সঙ্গে সঙ্গে লোক জমে গেল চারদিকে। নানাজনের নানা প্রশ্ন—কি হয়েছে হে? ব্যারাম আছে নাকি কিছু?

একটি যুবক বললেন, কেন উত্যক্ত করছেন বেচারাকে? জানেন না কি হয়েছে? ক্ষিধে, ক্ষিধেয় মরে যাচ্ছে বেচারা।

কৃতজ্ঞদৃষ্টিতে তাকালে শিবু তাঁর দিকে।

ছোকরা একটি ছুআনি তার হাতে ফেলে য়ে কোঁচাটা ধরে হন হন করে এগিয়ে চললেন। শিবু তড়াক করে উঠে দৌড়ুতে লাগলো তাঁর পিছু পিছু। রাস্তার লোক অম্নি হৈ-হৈ জুড়ে দিল।

ফিরে দাঁড়ালেন যুবকটি। শিবু হাঁপাতে হাঁপাতে বললে, বাবা গো একটা কাজ দিন আমাকে। আমি ভিখারী নই গো বাবা, চাষী গেরস্ত···

যুবক ঠোঁট উল্টে বললেন, কাজ? কাজ আমি কোথায় পাবো? দেখ না লিলুয়া, সোদপুর, দমদমা এই সব জায়গায়—অনেক কল-কারখানা ত আছে।

কাতরকণ্ঠে শিবু বললে, আমায় একবার নিয়ে চলুন গো বাবা। বড় কষ্টে আছি আমি।

যুবক আর একটা আনি ফেলে দিয়ে বললেন, যা, জ্বালাতন করিস নে আর।

তিনি চলে গেলেন। শিবু ভাবলে, তিন আনা পয়সা দিয়ে লালমোহন আর বিলাসীর জন্যে কিছু খাবার কিনে নিয়ে সেই বামুন মা ঠাকরুণের কাছে ছুটি ভাত চাইতে যাবে। ছু-দিন অন্তর অন্তর তিনি ভাত-তরকারি দেবেন বলেছেন তাকে, আহা বড় ভাল লোক গিন্নী! বিলাসীর জন্যে একটা পুরাণো শাড়ীও দিতে চেয়েছেন। হয়ত আজই দেবেন।

খাবারের দোকানের সামনে এসে শিবু কি কিনবে তাই নিয়ে মনে মনে গবেষণা আরম্ভ করে দিলে। বেশ অনেকগুলো খাবার হয়, অথচ এই পয়সায় কুলোয়···ভাবতে হবে বৈকি!

এদিকে লম্বা ডাঁটওয়ালা লোহার হাতা একটা কাঁচের জানলার খোপ দিয়ে বেরিয়ে সটান শিবুর পেটে এসে ঠেকলো। শিবু উঁকি দিয়ে বললো, কি?

সরে পড়ো দিকি বাপধন, বলে দোকানী অন্যদিকে তাকালে।

শিবুর আহত আত্মসম্মান এবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠলো। রাগতকণ্ঠে সে বললে, আচ্ছা লোক ত! খদ্দেরের পেটে গুঁতো মেরে কথা কও!

খদ্দের কথাটা শুনে দোকানী হয়ত একটু কৌতুক বোধ করলো, বললে, কি চাই হে খদ্দের?

শিবু তিন আনা পয়সা ছুঁড়ে ভেতরের দিকে ফেলে দিয়ে বললে, জিলিপি, বুঁদে, আব কচুরি দাও।

খাবারগুলো হাতে পেয়ে হঠাৎ মনে হল শিবুর, কতদিন সে খায় নি এসব। দুটো বুঁদে মুখে ফেলে দিলে। তারপর আর দুটো—বুঁদে শেষ হয়ে গেল। তখন টান ধরলো জিলিপিতে—একটা, দুটো, শেষে কচুরি, জিলিপিতে মিশিয়ে। যখন মোটে দুটো বাকী, মনে পড়লো ছেলেটাকে—ভাবলে থাক এ দুটো। বললেই হবে, একটা বাবু দিয়েছে, খা রে মোহন! নাঃ…কাল আবার পয়সা পেলে ওকে কিনে দেওয়া যাবে, আজ এটা খেয়েই ফেলি। সব শেষ হয়ে গেল। মনে মনে কেমন একটু কুণ্ঠা হতে লাগলো তার। ওদের না দিয়ে নিজেই খেয়ে ফেললো সব!

বামুন মা-ঠাকরুণের দরজায় তখন ডজনখানেক ভিখারী জুটেছে—সবই হাঁকছে—দাও মা, দুটো ভাত দাও মা, দুদিন খাইনি মা।

শিবু এসে নিঃশব্দে দাঁড়ালো। গিন্নীমা তাকে দেখলে নিশ্চয় দেবেন কিছু—নিজের মুখে বলেছেন।

হঠাৎ ঝাঁকড়া-চুলো এক ছোকরা বেরিয়ে এলো ভেতর থেকে। হাতে একটা ঠ্যাঙা মতো।

কোন দিকে না তাকিয়েই হাঁক দিলো সে, ভাগ, শালা শূওরের পাল! নইলে এখুনি পিটিয়ে সিধে করে দেবো সব।

নাছোড়বন্দের দল সুরু করলো, দয়া করো বাবা। গরীবকে ভাত দাও বাবা এক মুঠো।

বাবার ততক্ষণে হাত চলতে সুরু করেছে। মারের চোটে যে যেদিকে পারলো দৌড় দিলে। শিবু শুধু দাঁড়িয়ে রইলো।

ছোকরাটি তার দিকে তাকিয়ে বললে, কি হে নবাবপুত্তুর, তোমার বুঝি অত কমে শানালো না?

শিবু হাত জোড় করে বললে, বাবা, মাঠাকরুণ আমায় আসতে বলেছিলেন।

যেই বলা, অম্নি সপাং করে এক ঘা পিঠে, আর খটাস করে এক বাড়ী মাথায় বসিয়ে দিয়ে ছোকরা বললে, ভাগ, ভাগ, নইলে আজ আর আস্ত রাখবো না। চাল্লিশ টাকা চা'লের মণ—শালার বেটারা বলে কিনা ভাত দাও!

এবার আর না পালালে নয়। শিবু আস্তানার দিকে পা চালিয়ে দিলে। বেলা এদিকে গড়িয়ে গেছে—একটি দানাও আজ জোগাড় হয় নি। হ্যাঁ, কি খাবে ওরা? হায় হায় করে উঠলো শিবুর বুকের ভেতরটা, সবগুলো খাবার সে একাই খেয়ে ফেলেছে ভেবে। নিজের গালে চড় মেরে আর বারবার কান মলে সে শপথ করলো, এমন কাজ আর কোনদি করবে না!

আস্তানার কাছাকাছি এসে উল্টদিকের ফুটপথে একটা পানের দোকানের ছায়ায় দাঁড়ালো সে—শরীর টলছে, আর পারছে না হাঁটতে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সেখান থেকেই দেখলো সে, মোহন আর বিলাসী কি যেন খাচ্ছে! একটা চ্যাঙাড়ী, আর তার সাম্নে বেশ বড় একটা মাটির ভাঁড়···নিশ্চয় লুচি, আর সন্দেশ—রসগোল্লা! কোথায় পেলে? হয়ত সেই মাড়োয়ারী বাবুরা, সেদিন যারা ডাল রুটি দিয়েছিল, তারাই দিয়েছে। তার জন্যেও নিশ্চয় রেখেছে ওরা। শিবুর জিভটা আপনা থেকেই কেমন একটু সরস হয়ে উঠলো!

বিলাসী খাওয়া শেষ করে চ্যাঙাড়ী আর ভাঁড়টা দূরে ছুড়ে ফেলে দিলে। তারপর মুখ মুছে, একটা কি মুখে দিলে। কি সর্ব্বনাশ! সিগারেট খাচ্ছে যে! আর একটা জিনিষও শিবু এতক্ষণ লক্ষ্য করেনি—দুটো কেতাদুরস্ত ছোকরা উবু হয়ে বসে রয়েছে তার ডান দিকে, আর হেসে হেসে ক ব বলছে!

শিবুর মাথা চন করে উঠলো। হন হন করে এগিয়ে চললো সে। ি ৰ্দিক জ্ঞান হারিয়ে রাস্তা পার হতে গেছে, যেই, অম্নি একটা মোটরকার একেবারে র পিঠের ওপর এসে ঘচ্যাং করে ব্রেক কষে থেমে গেল, নইলে তখনি হয়ে গিয়েছিল তার সব শেষ! এই নিয়ে একটু সোরগোল উঠলো। বিলাসী তাকে দেখেই দৌড়ে এলো পাগলের মতো। সিগারেটটা সে . ফলে দিয়েছে এরি ভেতর এবং ছোকরা ি ও আর সেখানে নেই।

শিবু এসে গুম হয়ে বসলে। বিষণ্ণ থ করে বিলাসী বললো, পেলে ন।বুঝি কিছু আজ?

শি বু শুধু সংক্ষিপ্ত এ টি না বলে প করলো।

বিলাসী একটু দরদের সুরে বললো, ভিক্ষা করে কি আর দিন চলে? কি খাওয়াবো আজ ছেলেটাকে? সকাল থেকে ত একটি দানা পড়েনি পেটে!

শিবু বললে, কি করবো? চুরি ত আর করতে পারি না। পারিস ত দেখ তুই চেয়েচিন্তে, সোন্দর মেয়েছেলে দেখলে লোকে দিতেও পারে দু'মুঠো। খানিকক্ষণ প করে থেকে, কি মনে হল তার। আভাষে ইঙ্গিতে বিলাসীকে একটু সাবধান করে দিলে স। বললে, কলকাতা বিষম জায়গা—এখানে পুরুষের জান, আর মেয়েমানুষের মান বাঁচানো বড় সোজা ব্যাপার নয়। পথে নেমেছিস, ভিক্ষা করে খাচ্ছিস, সাবধান থাকিস কিন্তু।—

বিলাসী আমলই দিলে না যেন কথাটায়।

বেলা আন্দাজ তিনটের সময় খানকয়েক রুটি আর কিছু কুমড়োর তরকারি নিয়ে শিবু আস্তানায় ফিরলে। দেখে, ছেলেটা ছেঁড়া কানির ওপর পড়ে অঘোরে ঘুমুচ্ছে, বিলাসী নেই। কোথায় গেল সে! বোধ করি পাকের খোঁচাগারে···আচ্ছা আসুক, তার পর একসঙ্গে খাওয়া যাবে। কিন্তু কৈ? এক ঘণ্টা, দু'ঘণ্টা, তিন ঘণ্টা, শেষে সন্ধ্যা হয়ে গেল। বিলাসী আর ফেরে না। ব্যাপারটা কি? শিবুর বুকটা ধড়াস করে উঠলো। সরবোলা গাঁয়ের মেয়ে, হয়ত রাস্তায় বেরিয়ে গাড়ীচাপা পড়েছে—তারপর কোন হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে ফেলে রেখেছে। কি করবে সে এখন?

এদিকে ছেলেটা ঘুমুচ্ছে ত ঘুমুচ্ছেই। শি ঠিক করলো, তাকে জাগিয়ে তুলে নিয়ে খুঁজতে বেরুবে। ধাক্কাধাক্কি, চেঁচাচেঁচি, কিছুতেই পোড়া ছেলের ঘুম ভাঙে না—এক একবার মিটমিট করে তাকায়, আবার তক্ষুনি নেতিয়ে পড়ে। হঠাৎ শিবুর মনে হল, ছেলেটা বেঁচে আছে ত

উন্মাদের মতো তাকে কাঁধে তুলে নিয়ে সে দৌড়লো সামনের ডাক্তারখানাটার দিকে। ককিয়ে কেঁদে বললে শিবু, বাবুগো, দয়া করে দেখো আমার ছেলেটাকে একবার। নড়ছে চড়ছে না, সানসোড় নেই!

ডাক্তারবাবু লোকটি বেশ শান্তশিষ্ট। বললেন, দে ঐ টেবিলে শুইয়ে।

দেখে শুনে তিনি বললেন, কিছু খাইয়েছিস? সত্যি কথা বল, তাহলে এখনো বাচানো যেতে পারে।

শিবু বললো, কি খাওয়াবো বাবু? ভিক্ষে শিক্ষে করে যা পাই, তাই খাই সবাই মিলে ভাগসাগ করে। আজ ভিক্ষে থেকে ফিরে দেখি ওর মা নেই—আর ছেলেটা বেহুঁস হয়ে ঘুমুচ্ছে পড়ে পড়ে।

ডাক্তারবাবু মুখ গম্ভীর করে বললেন, হুঁ। ওকে আফিং খাইয়ে রেখে মাগী পালিয়েছে কারুর সঙ্গে।

অ্যাঁ? আঁৎকে উঠলো শিবু। হে হে করে কেঁদে উঠে বললে সে, বাঁচবে ত বাবু?

ডাক্তার কিছু না বলে পর্দাটা টেনে দিলেন—তারপর শিবুকে বললেন, ভয় নেই, এখন যা। ঘণ্টা তিনেক পরে আসিস, খোঁজ নিয়ে যাস।

শিবু ডাক্তারের পা দুটো চেপে ধরে কাতরকণ্ঠে বললে, দয়াময় বাবা, অন্ধের নড়ি—বাঁচিয়ে দাও গো বাবা।

ডাক্তার বললেন, বলেছি ত। এখন যা।

শিবু পথে নেমে পড়লো। তার পুঁটলি আর রুটিগুলো পড়ে রইলো সেই ফুটপথেই। পার্কে, গলিতে, বাজারে সে চীৎকার করে করে ঘুরতে লাগলো, 'পেন্টির মা', 'ও পেন্টির মা', 'বিলাসী', 'ফুলবৌ'!

মোহন বেঁচে উঠলো, বিলাসীও আর ফিরলো না। এদিকে শিবু ক্রমেই ভেঙে পড়তে লাগলো দিনের পর দিন। অন্নবস্ত্র জোটেনি, দুঃখের অন্ত ছিল না, তবু এত বড় বিশ্বাসঘাতকতা যে বিলাসী করবে—স্বামী-পুত্র ফেলে, কুলে কালি দিয়ে এমন করে যে চলে যাবে কারুর সঙ্গে—এ যেন সে ভাবতেই পারে না। কিন্তু সে না পারলে কি হবে? সত্যিকার জগতে ত তাই ঘটতে পারলো! ভেবে ভেবে আর কেঁদে কেঁদে শিবু ক্ষয় হয়ে যেতে লাগলো ভেতরে ভেতরে।

আজকাল আর সে ভিক্ষায় বেরোয় না। সকাল দশটায় কলেজের মেয়েরা ফুটপথের সকলকে খিচুড়ি দিয়ে যায়—তাই সে পাতা পেতে নেয়, নিজে কিছু খায়, কিছুটা খাওয়ায় মোহনকে। নিজের তার রোজই একটু করে জ্বর হচ্ছে—পায়ের গোছ দুটোও বেশ ফোলা ফোলা মনে হচ্ছে। শিবু বুঝেছে, আর বেশী দিন নয় তার। দুঃখের শেষ হয়ে আসছে, কিন্তু মোহন? ভিঁটে মাটি গেছে, অন্নবস্ত্র গেছে, কুলে কালি

পড়েছে, তবু বাপ দাদার নাম—ঐ শিবরাত্রির সলতেটুকু, ওকে এর পরে কে বাঁচাবে?

মোহনেরও শরীর দিনের দিন জীর্ণশীর্ণ কঙ্কালসার হয়েছে। হাসিখুসী নেই, ক্ষিধের কথাও আর বলে না, দিনরাত্রি কেমন যেন ধন্দ হয়ে থাকে—মাঝে মাঝে চোখ বেয়ে জল পড়ে, তখন বোঝা যায় কাঁদছে। শিবু তাকে বুকে চেপে ধরে—আর ব্যর্থ ক্ষোভে খালি ফুলে ফুলে কাঁদে। এক এক বার ভাবে—এই শীর্ণ মাংসপিণ্ডটাকে ন্যাকড়া চাপা দিয়ে মেরে ফেলে, সোজা যেদিকে চোখ যায় চলে যাবে সে। আবার চমকে ওঠে। আহা হা, বংশের শেষ চিহ্ন, বাপ দাদার নাম!

সেদিন সকালবেলা একটা লরী থামলো ফুটপথের গা ঘেঁসে—একটি মহিলা সমিতি অসহায় শিশুদের দুধ বিলি করছেন।

একটি সুন্দরী তরুণী নেমে এলেন গাড়ী থেকে। সিধে শিবুর কাছে এসে বললেন তিনি, এই দুধ নাও ছেলের জন্যে। ওর মা কৈ?

শিবু ক্লান্ত কণ্ঠে বললো, মাগো, ওর মা মারা গেছে।

মেয়েটি বললো, কিসে নেবে দুধ?

শিবু বললো, আর দুধ? ও কি আর বাঁচবে মা?

তরুণী লরীর কাছে গেলেন। দু' মিনিট পরে আর একটি তরুণীকে সঙ্গে নিয়ে ফিরে এলেন। দু'জনে ইংরেজীতে কি কথা হল—তারপর দ্বিতীয় তরুণী বললেন, এই, ছেলেটা আমাদের দাও, ওকে খাইয়ে পরিয়ে মানুষ করবো আমরা। আমাদের অনাথ আশ্রম আছে।

শিবু কৃতজ্ঞতায় বিগলিত হয়ে বললে, নাও মা, তাই নাও মা। ওকে বাঁচাও দুটো খেতে দিয়ে।

তরুণী দু'হাত দিয়ে মোহনকে তুলে নিলেন। শীর্ণ মোহন না করলে হাঁ, না করলে হুঁ।

দুধ বিতরণ শেষ হয়ে গেছে। ওরা মোহনকে নিয়ে লরীতে উঠলেন। গাড়ীতে ষ্টার্ট দিলে।

হঠাৎ কি মনে হল শিবুর। দৌড়ে গিয়ে গাড়ীর পাশে দাঁড়ালো সে। মুখ বাড়িয়ে একজন বললেন, কিরে? কি চাস?

—দাও মা, আমার ছেলে দিয়ে দাও, শিবু বললে।

ছেলে নিয়ে কি করবি? না খাইয়ে মেরে ফেলবি ত! উত্তর এলো ভেতর থেকে। ওর আর কি আছে?

গাড়ী ছেড়ে দিলে। হঠাৎ শিবুর মনে হল, ভেতর থেকে মোহন যেন ডুকরে কাদছে! দিগ্বিদিক জ্ঞান হারিয়ে ছুটতে লাগলো শিবু গাড়ীর পিছু পিছু। দিয়ে যাও, দিয়ে যাও মা, আমার ছেলে নিয়ে চলে যেও না গো—আমি বড় দুঃখী গো!

দেখতে দেখতে গাড়ী অদৃশ্য হয়ে গেল। ক্লান্ত শিবু আর পারলো না। অতীত-বর্ত্তমান সব একাকার হয়ে তার চোখের সামনে দুলতে লাগলো। একটা থাম মতো কি ধরে সে বসে পড়লো। পেটের আর বুকের ভেতর হঠাৎ যেন কি করে উঠলো তার, দেখতে দেখতে অজ্ঞান হয়ে শিবু পড়ে গেল রাস্তার ওপর।

চোখ তাকিয়ে শিবু দেখলো, ঘোমটার মতো মাথায় কি জড়ানো একটি মেয়ে বসে বসে তার গায়ে হাত বুলচ্ছে। চোখ বুঁজে ফেললো সে—তারপর অস্পষ্ট করুণ কণ্ঠে বললে, ফুলবৌ!

খিল খিল করে একটা হাসির শব্দ উঠলো। মেয়েটি, বললে,—মিঃ বোস, আসুন, আপনার রুগী কথা বলছে।

হবু ডাক্তারটি গলায় ষ্টেথস্কোপ নিয়ে এগিয়ে এলেন। নাড়ী ধরে বললেন, এই, তোমার নাম কি? বাড়ী কোথায়?

ভাঙাগলায় শিবু বললে, আমার নাম জানো না? শিবু, তারণ ঘোষেরবড় ব্যাটা। আরামডাঙার তারণ ঘোষকে জানো না?

—আরামডাঙা ? যশোরের লোক তুমি ? ডাক্তার জিজ্ঞাসা করলেন।

—হ্যাঁ গো হ্যাঁ, শিবু জবাব দিলে।

হঠাৎ ডাক্তার চমকে উঠে বললেন, কে. শিবু ? তুই হাঁসপাতালে এলি কি করে ? বৌ-ছেলে কোথায় তোর ?

বৌ-ছেলে ! ঘোলা চোখে শিবু তাকালে একবার। তারপর আবার চোখ বুঁজে ফেললো।

নার্সটি জিজ্ঞাসা করলে, চেনা লোক নাকি ?

ডাক্তার বললেন, দেশের লোক, আসার পথে বেচারারা হল্ট করেছিল ক'দিন আমার ওখানে। আমি তখন ছুটিতে ছিলুম। ওর বৌটা ছিল চমৎকার দেখতে...।

একটি মেয়ের ইতিহাস

সলজ্জ কাতরকণ্ঠে মেয়েটি বললে, আমার নাম কমলা। বড় জোর বছর পঁচিশ বয়স, কালোর ওপর চমৎকার সুশ্রী চেহারা—দেখলেই বোঝা যায়, গৃহস্থ ঘরের মেয়ে। নিতান্তই পেটের দায়ে অনেকের মতো আজ পথে বেরুতে বাধ্য হয়েছে। কোলে একটি সাত-আট মাসের বাচ্চা মেয়ে। এখনো চেহারায় তার শিশুসুলভ কমনীয়তা জ্বলজ্বল করছে—স্তন পান করতে করতে মায়ের কোলেই ঘুমিয়ে গেছে। ছেঁড়া ন্যাকড়া বিছিয়ে তাকে ফুটপথে শুইয়ে দিলে কমলা। তারপর করুণ দৃষ্টিতে তাকালে আমার দিকে।

বললাম, কিছু খেয়েছো আজ ?

ঘাড় নেড়ে জানালো—না। তারপর মেয়েটার দিকে আঙুল দেখিয়ে ইঙ্গিতে কি বললো। বুঝলাম ওর জন্যেই কিছু চাইছে।

বললাম, কাছে ত মোটে একটা দু'আনি আছে। যদি সঙ্গে আসো তাহলে একটু দুধ দিতে পারি ওর জন্যে—আর হয়ত আমার স্ত্রী একখান কাপড়ও দিতে পারেন তোমাকে। এই গলিটার বাঁকে ঐ যে লাল বাড়ীটা দেখছো—ওতেই থাকি আমি।

মেয়েটাকে ন্যাকড়া শুদ্ধ গুটিয়ে কোলে তুলে নিলে কমলা। বুঝলাম রাজী হয়েছে সে সঙ্গে যেতে।

গণগণ করছে দুপুরের রোদ—রাস্তার পিচ গলে আগুন হয়ে উঠেছে। আগে আগে ছাতা মাথায় দিয়ে চললাম, পেছে পেছে কমলা। রোদের হল্কায় আর ক্ষুধার জ্বালায় কোলের মেয়েটা ককিয়ে উঠেছে থেকে থেকে, 'ওয়া', 'ওয়া'। পথে কমলা বললে তার কাহিনী—অতি সংক্ষিপ্ত সে কাহিনী। স্বামী তার অন্যের খেত-খামারে কাজ করতো, নৌকা বাইতো, গাঁয়ের হাটে ফল-পাকুড় বেচতো—এক রকম করে দিন চলতো তাতেই। এবার দেশ জুড়ে নামলো আকাল—টাকায় এক সের চাল—ক্ষেতের কাজ উঠে গেল, নৌকো বন্ধ হল, লোকে জন-মজুর ডাকে না—তার ওপর এলো বন্যা—স্বামীও সেই সময়ে অসুখে পড়লো, আর ক'দিন পরেই মারা গেল তখন আর কি করে সে? দিনকতক মেগে পেতে চালালো নিজের পেটটা। শেষটা বেগতিক দেখে আর পাঁচজনের সঙ্গে সহরে এলো ভাতের খোঁজে।

ঠিক এই কাহিনী বা অনেকটা এই রকমের কাহিনী আজ শুনছি হাজার হাজার নিরাশ্রয়ের মুখে। নূতনত্ব কিছু নেই। নিঃশব্দে পথ পাড়ি দিতে লাগলাম।

দরজা খুলে দিয়ে স্ত্রী আমার পেছনে মেয়েটিকে দেখেই রেগে উঠলেন। বললেন, আবার এই বেলায় একটা লোক কুড়িয়ে আনলে? ঘরে কি আছে যে তাই খেতে দোব?

সবিনয়ে বললাম, দেখনা যদি কিছু করতে পারো। কি সুন্দর ওর

মেয়েটা দেখো একবার—ওটাকে অন্ততঃ কিছু দাও, বিকেলের চায়ের দুধটা···

ইতিমধ্যে ক্ষুধার্ত্ত মেয়েটা জেগে উঠে কাঁদতে সুরু করেছে। স্ত্রী দু'একবার ইতস্ততঃ করে হঠাৎ কমলার কোল থেকে ছিনিয়ে তাকে নিজের বুকে তুলে নিলেন। ক্ষুধার্ত্ত দামাল শিশুও মুহূর্ত্তেই তাঁর বুক তোলপাড করে খুঁজতে সুরু করলো, কোথায় তার খাদ্যের উৎস। আবার দু'একবার ইতস্ততঃ—তারপরই স্ত্রী অবলীলায় তাকে স্তন দিতে সুরু করে দিলেন। ক্ষুধার্ত্ত, অবোধ, অসহায় মানবশিশু অন্যের মাতৃস্তন্য অপার বিশ্বাসে আত্মসাৎ করতে লাগলো—আর কমলা ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে দেখতে লাগলো তাই।

অনেকক্ষণ একটানা খাওয়ার পর পরিতৃপ্ত শিশু আপনিই ছেড়ে দিলে। তাকে মেঝেয় নামিয়ে দিয়ে বীণা বললেন, সুন্দর মেয়েটা—না?

মেয়েটার মুখে তখন হাসি ফুটেছে। ঘরময় সে হামা দিয়ে দাপাদাপি করে বেড়াচ্ছে!

আমি বললাম, নাও না ওটাকে। আমাদের ছেলেমেয়ের সঙ্গেই থেকে যাবে।

বাধা দিয়ে বীণা বললেন, কি যে বলো তার ঠিক নেই।

তারপরই তিনি ভেতরে চলে গেলেন। কমলার জন্যে একখানা পাঁউরুটি, কিছু তরকারি, আর একটু চিনি এনে দিলেন। দেখি, কমলা সেগুলো সযত্নে বেঁধে নিলে তার পুঁটলিতে। আমি বললাম, খা না এখানে বসে।

বললে, না বাবু, একজনরা ফ্যান দিয়েছিল, তাই খেয়েছি। ও-বেলা খাবো অখন।

স্ত্রীকে বললাম, একখানা কাপড় যদি দিতে ওকে। তোমারি বয়সী—বে-আব্রু হয়ে বেড়াচ্ছে বেচারা।

দেখি তাঁর কাঁধে একখানা পুরানো শাড়ী রয়েছে। বুঝলাম, আমার আগেই তিনি অনুভব করেছেন ও-জিনিষটার প্রয়োজনীয়তা। সেটি এবং সেই সঙ্গে একটি টাকা দিয়ে তিনি কমলাকে বিদায় দিলেন। শেষবার মেয়েটার হয়ে আর একটু আবেদন করলাম। গৃহিণী একটিমাত্র কথাতেই সমস্ত অনুনয়ের ওপর যবনিকা টেনে দিলেন, না, না, ভেবেচিন্তে কাজ করতে হয়!

* * *

ভেবেছিলাম, কমলা এরপর প্রতিদিনই আসবে। বলতে কি বড্ড মমতা হয়েছিল মেয়েটার ওপর। যদিও সামর্থ্য আমার বেশী নয়, তবু ওকে বাড়ীতে সাময়িকভাবে আশ্রয় দিতে চেষ্টাও একটু করেছিলাম। হয়ত দিতামও। কিন্তু কমলা আর এলো না।

একদিন কমলার কথা তুলে স্ত্রীর কাছে গালাগালিও খেলাম মন্দ নয়। তিনি বললেন, হাজার হাজার লোক আজ নিরন্ন নিরাশ্রয় হয়েছে, ক'জনকে তুমি ঠাঁই দেবে?

বললাম, সকলকে বাঁচাতে পারবো না বলে একজনকেও বাঁচাবো না, এ কি যুক্তির কথা হল বীণা?

বীণা বললেন, না হক, আজকের দিনে দায়ে পড়েই মানুষকে স্বার্থপর হতে হয়েছে। ভাবো ত, চাল, কাপড় আর কয়লার জন্যে নিজেদের কি নাকাল হচ্ছে! ছেলে-মেয়েদের দুধ আর জলখাবারের পরিমাণ কি রকম কমেছে! এর ওপর যদি বাড়ীতে তুমি লোক বাড়াও, তাহলে ঐ কয়টি টাকায় আমি চালাবো কি করে? ওদের বাঁচাতে গিয়ে, নিজের ছেলে-মেয়েদের ত মেরে ফেলতে পারি না!

এবার আমারও রাগ হয়ে গেল। বললাম, দেখো বীণা, ওদের সঙ্গে আমাদের তফাং মাত্র একটা ধাপের—সে ধাপটা হল একটা চাকরি। আজ যদি সেটা ছুটে যায়, তাহলে ওদের মতোই আমাদেরও পথ ছাড়া

আশ্রয় নেই! তখন আমাদের মুখের ওপর যদি লোকে ঠিক এম্নি করেই দরজা বন্ধ করে দেয়!

বীণা সাধারণত. শান্ত মানুষ, তর্ক করার প্রকৃতি তাঁর নয়। একটু হেসে তিনি বললেন, মেয়েটা তরুণী না হলে কি ঠিক এতখানি কাতর হতে ওর জন্যে?

একথা বা এই ধরণের কথা পত্নীজাতির কাছে হয়ত অপ্রত্যাশিত নয়। চুপ করে থাকলেই ভালো হত—তবু বললাম, বীণা, আমাকে ত তুমি চেনো না এমন নয়।

বীণাও লজ্জিত হয়েছেন হঠাৎ কথাটা বলে ফেলে! তিনি আমার একটা হাত চেপে ধরে বললেন, সত্যি কিছু মনে করে বলিনি। সত্যি না!

যাই হক, কমলার কথা মন থেকে মুছে গেলনা আমার। আসতে যেতে ট্রামের মোড়ে দাঁড়ালেই সেই জায়গাটার দিকে তাকাই, যেখানে ফুটপথের ওপর ফুটফুটে মেয়েটাকে কোলে নিয়ে কমলাকে বসে থাকতে দেখেছিলাম। কোথায় গেল বেচারী? এই পঁচিশ ত্রিশ লক্ষ লোকের সহরে পেটের দায়ে কোন অলক্ষ্য গলির অন্ধকারে গিয়ে পড়লো সে?

সেদিন রবিবার—বিকেলের দিকে যাচ্ছি এক বন্ধুর বাড়ী দেখা করতে। হঠাৎ দেখি, ফুটপথের একটা নলকূয়ো থেকে বালতি ভরতি করছে কমলা, আর মিস্ত্রী গোছের একটা লোক দুই ঠোঁটে একটা জলন্ত বিড়ি চেপে ধরে, তার হয়ে হ্যাচাং হ্যাচাং করে হাতলটা নাড়ছে।

সাম্নে এসে দাঁড়ালাম—দেখি কমলার মাথায় তেল পড়েছে, চুলে অল্প একটু সিঁথে, পরণের কাপড়খানাও তার মোটের ওপর ঝকঝকে। আরো নূতনত্ব—গায়ে তার একটা সেমিজ। বললাম, কি রে কমলা, কেমন আছিস?

কমলা যেন কেমন বিব্রত হয়ে পড়লো। মিস্ত্রী গোছের লোকটাকে সে বললে, বালতিটা নিয়ে তুমি এগোও, আমি আসছি।

লোকটা ক্রূরদৃষ্টিতে বারকয়েক আমার দিকে তাকালো, তারপর

মুখে একটা অর্থসূচক অঃ শব্দ করে বালতিটা নিয়ে পাশের বস্তিটার ভেতরে ঢুকে গেল। আমারও কেমন বাধো বাধো ঠেকতে লাগলো। এ ত সে কমলা নয়, এ যেন অন্য মেয়ে!

কমলা বললে, নিত্য আর কে খেতে দেবে বাবু? ও লোকটা বললে, আয় আমার সঙ্গে, ঘর আছে থাকবি, দুটো রাঁধাবাড়া করবি, নিজেও খাবি, আমাকেও দিবি। কি আর করি?

জিজ্ঞাসা করলাম, ও কে, কি করে?

—টিনের মিস্ত্রী, খুব বড় মিস্ত্রী বাবু, অনেক পয়সা রোজগার করে। তবে স্বভাব ভালো নয়, মদটদ খায়। অন্য দোষও আছে।

বললাম, হুঁ। তা তোর মেয়েটা কেমন আছে?

নির্লিপ্ত কণ্ঠে কমলা বললো, মেয়ে ত মরে গেছে!

চমকে উঠলাম। সে কি? অমন নাদুশ নুদুশ মেয়ে, কি হয়ে মারা গেল এই ক'দিনের ভেতর?

কমলা বললো, কিছু হয়নি। না খেয়েই মলো।

—কেন তোকে যে বলেছিলাম, রোজ ওর জন্যে দুধ নিয়ে যাবি আমার ওখান থেকে। কেন যাস নি?

—ইচ্ছে করে যাই নি বাবু।

বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলাম তার দিকে। কমলা নিজে থেকেই বললে, কি করি বাবু, নিজেই আমি জলে ভাসছি—ঐ কচি বাচ্চা নিয়ে এর ওপর আবার যাই কোথায়? দু'দিন একদিনের ত কাজ নয়, আস্ত কাল পড়ে আছে। শেষে মায়া-মমতা বিসর্জ্জন দিয়ে না খাইয়ে রাখলাম—তারপর ঝাড়া হাত-পা হল!

রাগে আর ক্ষোভে তখন আমার সমস্ত শরীর কাঁপছে। বললাম, তুই বেটী আস্ত খুনী। তোকে আচ্ছা করে ঠ্যাঙানো উচিত। কেন তুই আমায় দিয়ে এলি না মেয়েটা?

আহম্মকের মতো মুখ করে কমলা বললে, হ্যাঁ বাবু, কাঙালের মেয়ে তোমরা নিতে কিনা ? তারপর একটু থেমে সে বললো, ঢের লোকই ত ডাকতো রোজ—কিন্তু ঐ আপদকে কেউ নিতে চাইতো না। সব্বাই বলতো, ওটাকে শেষ করে দে। কি করবো আমি ? শেষটা মেরেই ফেললাম।

কথাবার্ত্তা কইছি, হঠাৎ দেখি সেই মিস্ত্রী পুঙ্গব একখানা গামছা পরে আর এক দফা বালতি হাতে হাজির। সে বললে, কমলাকেই সম্ভবতঃ, কি বাবা, প্রেম যে আর ফুরোয়ই না ! ওসব কিন্তু চলবে না—তা বলে দিচ্ছি !

কমলা আস্তে ব্যস্তে বললে, যাচ্ছি বাবা, মাকে বলো আমার কথা।

তার বাবা কথাটা খটাস করে কেন জানি না কানে লাগলো। নিঃশব্দে চলে গেলাম। স্ত্রীকে বিশেষ ইচ্ছা সত্বেও কিছুই বললাম না, কোথায় যেন বাধতে লাগলো।

* * * *

দিন দশেক পরে অফিস থেকে বাসায় ফিরে দেখি রোয়াকে বসে কমলা কাঁদছে এবং চৌকাঠের এপিঠে গোড়ায় বসে স্ত্রী সেলাই করছেন, আর তারি ফাঁকে ফাঁকে কমলার কথা শুনছেন।

কাহিনী সংক্ষিপ্ত—কমলার মিস্ত্রী তাকে খেদিয়ে দিয়েছে, কিন্তু মিস্ত্রী এবং তার দুটি স্যাঙাতের দৌলতে কমলা কঠিন একটা রোগে আক্রান্ত হয়েছে। এখন সে যায় কোথায়, খায় কি, কি দিয়ে বা চিকিৎসা করায় ?

বীণা পূর্ব্ববৎ একটি টাকা দিয়ে তাকে বিদায় করলেন। শুয়ে শুয়ে আমি শুধু ভাবতে লাগলাম, কোথায় এর শেষ ? সহস্র সহস্র কমলার জীবনেই ত দেখা দিয়েছে আজ এই দুর্ব্বিপাক ! বিনা অপরাধে মনুষ্যত্বের এই লাঞ্ছনা · কোথায় এর প্রতিকার ?

বিশ বছর পরে

হারাণ বাঁড়ুজ্যের বাইরের ঘরে আজকে আর সন্ধ্যার আসর বসেনি। থুৎনি আর কান বালাপোষে ঢেকে হারাণ বাঁড়ুজ্যে একাই তক্তপোষে বসে হারিকেনের আলোয় কি একটা জিনিষ পড়বার চেষ্টা করছেন। নিকেলের চশমাটা নাকের ডগা পর্যান্ত টেনে এনে, ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কোন রকমেই যেন জুত করে পড়া হচ্ছে না।

লাঠি ঠুকতে ঠুকতে ঘরে এসে ঢুকলেন যোগীন চাটুজ্যে।

—কি হে বাঁড়ুজ্যে, পড়ছো কি ?

—এই এম্নি। বসো বসো।

হারাণ বাঁড়ুজ্যে হাতের জিনিষটা লুকিয়ে ফেললেন।

যোগীন চাটুজ্যে ময়লা তাকিয়া একটা টেনে নিয়ে বাগিয়ে বসলেন। তারপর বললেন, যাই বলো শীতটা আজ পড়েছে বেজায়।

—আর পড়বে না ? অঘ্রাণের আজ যে···

হঠাৎ হারাণ বাঁড়ুজ্যে যেন চমকে উঠলেন। তারপর একটা ঢোক গিলে নিয়ে বললেন, মনে আছে চাটুজ্যে, অঘ্রাণ মাসের সাতাশে ?

সাতাশে ? কি তাতে ?

—ভুলে গেলে ? কি উপঝরণ বৃষ্টি, আর সেই সঙ্গে কি শীত! তোমার চিঠি নিয়ে হাবলা গিয়ে আমায় ডেকে আনলো। এসে দেখি চিত্তির! উঃ সে কি দিনই গিয়েছে!

চাটুজ্যে জোরে একটা নিশ্বাস ফেলে খানিকক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর বললেন, বছর কুড়ি হল বোধকরি!

—হ্যাঁ, এই অঘ্রাণেই কুড়িতে পড়লো। এই কুড়ি বছরে কি ভাঙা-চোরাটাই না হয়ে গেল! এ-আমি যে সেই-আমি, তা যেন নিজেরই বিশ্বাস হয় না!

—তা সত্যি !

যোগীন চাটুজ্যে পকেট থেকে টিনের কৌটা বের করে একটা বিড়ি নিয়ে ধরালেন, আর একটা এগিয়ে দিলেন বাঁড়ুজ্যেকে। দু'হাতের খোলে দেশলাই কাঠি জ্বালিয়ে, দাঁতে বিড়ি চেপে ধরে বললেন, শীগ্রী নাও—একটি মাত্র কাঠি।

একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, সে রাত্রে তুমি ত মজাসে ফুলকুমারীর ঘরে আড্ডা জমিয়েছিলে, না ?

—মনে আছে তোমার ফুলকুমারীকে ? উঃ কি নাবানোটাই নামিয়েছিল মাগী আমাকে—মদ, জুয়া, দাঙ্গা, চব্বিশঘণ্টা !

—আর ঘরে পরিবার একলাটি। তার হাতে নেই একটি পয়সা, পরণে নেই কাপড়, হেঁসেলে হাড়ি চড়ে না, বাড়ীওলার ভাড়ার তাগাদায় প্রাণ অতিষ্ঠ !

হারাণ বাঁড়ুজ্যে ডুকরে উঠলেন, চাটুজ্যে, ভাই, কোন লোক যেন আর মদ না খায়, মেয়েমানুষের রূপে যেন না ভোলো। নইলে পঁয়তাল্লিশ টাকা মাইনে পেতাম, দু'জনের ত খাসা চলে যেতো। কি শনিতে পেলো, তারপর থেকেই তলিয়ে গেলাম জাহান্নামে ! ফিরেও তাকালাম না বেচারীর দিকে।

চাটুজ্যে মুখ বিকৃত করে বললেন, ফিরে ত তাকাওইনি, উল্টে তার গয়নাগুলো, ভালো কাপড়-জামা গুলো, সখের জিনিষপাতি গুলো, সব নিয়ে গিয়ে ফুলকুমারীর গব্বে তুলে দিয়েছো !

—আর বলো না ভাই, আমি কি মানুষ ছিলাম ? হয়েছিলাম আস্ত জানোয়ার।

—নইলে শনিবার সন্ধ্যায় বাড়ী ফিরে এর ওপর আবার তাকে ঠেঙাও ? কি না, তোমার জন্যে চা তৈরী নেই, হালুয়া বানানো হয়নি। কোথা থেকে হবে, সে কথাও তোমার মনে হত না !

—কিন্তু আশ্চর্য্যি মানুষ ছিল ভাই। যেমন করেই হক, জোটাতো ত সব!

—কোথা থেকে জোটাতো বলোত ?

—তা কি আর জানিনে চাটুজ্যে ? তুমি দিতে। তোমার মতো বন্ধু যেন মানুষে জন্ম জন্ম পায়। আরে ভাই, তুমি না থাকলে ভদ্দর লোকের মেয়েকে লোকের বাড়ী ঝি-গিরি করে খেতে হত—গোল্লায় যেতে হত। সে যে কত বড দুঃখ, তা ত তখন বুঝিনি!

চাটুজ্যে গলাটা একবার ঝেড়ে আলোয়ানটা ভালো করে মুড়ি দিয়ে বসলেন, তারপর কেমন যেন বিমর্ষতার সঙ্গেই বললেন, আচ্ছা বাঁড়ুজ্যে, তুমি ত বাড়ী থাকতে না—আসতে কালে-ভদ্রে—আমি যে রাধার খবরা-খবর করতাম, তোমার সন্দেহ হত না ?

বাঁড়ুজ্যে লাফিয়ে উঠলেন। উত্তেজিত গলায় বললেন, সন্দেহ, তোমাকে ? রামো রামো! মাতাল ছিলাম, অসৎ ছিলাম, সবই ঠিক, কিন্তু তুমি যে কতবড মহৎ, সে জ্ঞান আমার টনটনে ছিল। তখন তোমারই বা আয় কত ? পঞ্চাশ টাকা বড়জোর! একপাল ছেলেমেয়ে, বউ মারা গেছে—বাড়ীতে পুষছো বিধবা পিসতুতো বোনকে, আবার আমার সংসারের খরচ চালাচ্ছো, দেখাশুনো করছো! তোমার মতো মানুষ কলিতে ক'টা হয়।

চাটুজ্যে সজোরে একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে চুপ করলেন। তারপর বললেন, কিন্তু মন্দও ত কিছু হতে পারতো!

—হলেও আমি দোষ দিতাম না। বিয়ে করেছিলাম আমি, ভরণ-পোষণের দায়িত্ব ছিল আমার। আমি গেলাম বয়ে, টাকা-পয়সা ওড়াতে লাগলাম মদে আর মেয়েমানুষে। তার দিকটা ভাবলামই না। সে যদি নিজের পথ নিজে বেছে নিত, তাহলে আমার বলবার কিছুই ছিল না। স্বামীর কর্ত্তব্য ত করেছো তুমিই। তোমাকে যদি সে···

চাটুজ্যে বিদ্রূপ করে বললেন, বলছো বটে, কিন্তু তখন সহ্য হত না!

আলবৎ হত, বলে বাঁড়ুজ্যে আবার একবার নড়েচড়ে বসলেন। বললেন হওয়াই ত স্বাভাবিক ছিল, হয় নি তার কারণ তুমি ছিলে দেবতা আর সে ছিল দেবী।

হুঁঃ বলে চাটুজ্যে চুপ করলেন।

বাঁড়ুজ্যে বললেন, কত দুঃখ দিয়েছি, কত অত্যাচার করেছি, তবু সব মুখ বুঁজে সহ্য করেছে। দশ দিনে পনেরো দিনে একবার বাড়ী যেতাম, তাতেই সন্তুষ্ট। যেবার তাও যেতাম না, সে কি ভাবনা আমার জন্যে! আফিসে চিঠি লিখতো। এই ত একখানা চিঠি একটু আগেই পড়ছিলাম! আমার মতো জানোয়ারকে এই চিঠি লিখতে পারে যে, সে কি দেবী ছাড়া আর কিছু?

চাটুজ্যে আবার বললেন, হুঁঃ।

হারাণ বাঁড়ুজ্যে আলোটা একটু উস্কে দিয়ে, চিঠিখানা তাঁর হাতে দিলেন। চিঠিখানা উল্টেপাল্টে যোগীন চাটুজ্যে বললেন, ঠিকানাটা আমারই লেখা, মুসাবিদাটাও বোধ করি আমারই। সব চিঠিরই বয়েনটা তৈরি করে দিতে হত আমাকে। তারপর ঠিকানা লিখে ডাকে দিতে হত।

—তাছাড়া আর কে দেবে? লোকই বা আর কে ছিল?

অনেকক্ষণ তারপর দুজনেই চুপচাপ রইলেন। হারাণ বাঁড়ুজ্যের মুখ থেকে দীর্ঘ নিশ্বাসের সঙ্গে বেরিয়ে এলো একটি কথা, সতী আর অসতীর তফাৎটা দেখো। ফুলকুমারীর জন্যে আমি করিনি কি? পরিবারকে না খাইয়ে মেরেছি, নিজে অধঃপাতে নেমে গেছি, ভদ্রলোকের কাছে বসতে পাইনি। কিন্তু শেষকালে সেই কিনা আমাকে পথে বসিয়ে পালালো ফকির গড়াইয়ের সঙ্গে?

—ফকির গড়াই, সেই তোমার অফিসের বড়বাবু না?

হ্যাঁ। সে যেই খবর পেলো, আমার হাতে অমন একটা চীজ রয়েছে,

অমনি ছোঁ মেরে উঠিয়ে নিলে। আর শয়তান মাগীও ফিরে তাকালো না! তেম্নি শিক্ষাও পেয়েছে!

—কি রকম?

—তুমি ত জানোনা সে সব। বউ মারা যাবার পর থেকেই ত তোমার সঙ্গে ছাড়াছাড়ি। তারপর এই ত কবছর হল আবার নতুন করে দু'জনে মোলাকাং! এর ভেতর কত ওলট-পালটই হয়ে গেছে! ফকির গড়াই ত নিয়ে গেল তাকে, তারপর হল তার ব্যামো, তখন পালালো ছেড়ে। পেটের দায়ে চাষা-ছোটলোক ধরতে লাগলো, মাগী শেষটা পাগল হয়ে একদিন রাস্তায় গাড়ী চাপা পড়ে মরলো! আমায় সর্ব্বস্বান্ত করে—আমার গালে চড় দিয়েছিল, কিন্তু আমি তাকে ভুলতে পারিনি চোরের মতন পেছুন পেছুন ঘুরেছি। শেষটা মরে সে-ও বাঁচলো, আমিও বাঁচলাম। তারপর থেকেই সুপথে এসেছি ভাই। আজ বুঝতে পেরেছি, বৌকে কি শাস্তিই দিয়েছি আমি বিনা দোষে। সতীলক্ষ্মী স্বর্গে গেছে, তার কাছে ক্ষমা চাইতেও আমার সাহস হয় না!

চাটুজ্যে গম্ভীর মুখে বললেন, ফুলকুমারী পাগল হয়েছিল, আমিও শুনেছি। নাকি বিধু গয়লার দোকানের সামনে চট পেতে পড়ে থাকতো, আর ঘোড়ার গাড়ীর গাড়োয়ানরা তাকে নিয়ে দিনরাত ফষ্টি নষ্টি করতো।

—রামো রামো, সে কথা আর বলো না। ঐ রকম আগুনের মতো রূপ, সে যেন পুড়ে কড়ি হয়ে গিয়েছিল—দেখলে ঘেন্না করতো। পাপের ফল! ভয় হয়, আমারো ঐ রকম না হয়!

—আর হবে কবে? তোমারই বলো, আমারই বলো, দিন ত ফুরিয়েছে। এবার গেলেই হয়! পাপ-তাপ যা করেছি, তা সঙ্গে নিয়েই চলে যাবো—এ-পারে আর বোধ হয় কোন ভয় নেই!

—পাপ ত তোমার কিচ্ছু নেই ভাই, আমারই গলায় গলায় পাপ!

—নাও ত জানতে পারো !

—আমি বিলক্ষণ জানি।

—জানো না কিছুই। দেখো ভাই বাঁড়ুজ্যে, দিন আর নেই, ঐ যে বললাম, যাবার সময় হয়েছে। তাই যে কথাটা এতকাল বলিনি, আজ সেটা বলে যাই। নইলে আমার সম্বন্ধে একটা মিথ্যে উঁচু ধারণা নিয়ে বসে থাকবে।

—বুঝেছি, ঐ বিধবা পিসতুতো বোন বকুলের সঙ্গেই বুঝি…? ফুলকুমারীও আমার দূর সম্পর্কের…

নির্ব্বিকার মুখে চাটুজ্যে বললেন, না গো না, তোমারই পরিবার রাধারাণীর সঙ্গে, আর সে যে মলো, সে-ও আমারই পাপে। ওষুধ খাওয়াতে হয়েছিল। বুঝেছো এবার দেবতাদের ব্যাপারটা ?

বাঁড়ুজ্যে চীৎকার করে উঠলেন, চাটুজ্যে তুমি ? তুমি, আর সে ? এঁ্যা ? বিশ বছর আমি এই তোমাদের পূজো করে আসছি, আর নিজেকে খালি দিয়ে আসছি গঞ্জনা ?

—ভুল করেছো ভাই, দেরীতে হলেও সেটা শুধরে দিলাম।

—বেরিয়ে যাও তুমি আমার বাড়ী থেকে, তুমি বিশ্বাসঘাতক।

—হ্যাঁ ভাই, তাই আমি। আচ্ছা চললাম।

হঠাৎ বাঁড়ুজ্যে হু-হু করে কেঁদে উঠলেন, না, না, যেও না, যেও না। আমি বিশ্বাস করি না, কিচ্ছু বিশ্বাস করি না। তাছাড়া, আমার চোখের আড়ালে এতকালই যখন থাকলো, তখন এ ক'টা দিনও থাক !

চাটুজ্যে কিন্তু তখন লাঠি ঠুকতে ঠুকতে পথে নেমে পড়েছেন।

আকস্মিক

সুধীন বললে, আমি এই ঝোপটার ছায়ায় বসে একটু জিরিয়ে নিই। তুই বরং ততক্ষণ শীলাকে জীব-জন্তুগুলো দেখিয়ে আন।

প্রস্তাবটা লোভনীয়। তরুণী বন্ধু-পত্নীর সঙ্গে শীতের মধ্যাহ্নে চিড়িয়াখানায় এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়ানোর এবং আবশ্যক মতো প্রাণীতত্ত্বে পাণ্ডিত্য ফলানোর সুযোগ বাংলাদেশে কোন অবিবাহিত যুবকের ভাগ্যে সহসা মেলে না। কিন্তু কেন জানি না, গোপেন প্রস্তাবটা ঠিক লুফে নিলে না। সে একটু খুঁৎ-খুঁৎ করেই বললে, তুইও চ না বাবু।

—না, না, তোরা যা। তোরা হলি সাহিত্যিক টাহিত্যিক মানুষ, দু'জনে মিলবে ভালো। আমি একেবারেই গদ্য, আমি একটু এখানে বসে বরং···

শীলা কথা কেড়ে নিয়ে বললে, মার্ক্সের পুঁথিটা উল্টাই—কেমন? চলুন, চলুন, আমরা সরে পড়ি। দেখতে পাচ্ছেন না, আমাদের বিদেয় করবার জন্যে কি রকম আগ্রহ!

গোপেন আর একটু চেষ্টা করলো। কিন্তু সুধীনের সেই একই কথা, যা, যা, মানুষ হলি না কোন কালে! একটা মেয়েছেলের রিস্ক নিতে সাহস করিস না?

—রিস্ক? শীলা জিজ্ঞাসা করলো কৃত্রিম কোপের ভঙ্গীতে।

মৃদু হেসে সুধীন বললো, তা নয়?

বিরক্ত মুখে শীলা উত্তর দিলে, ব্যাটাছেলে নিয়েও ত কম রিস্ক নয়, বিশেষ করে মার্ক্সপন্থী ব্যাটাছেলে নিয়ে!

সুধীনের আবার সেই হাসি।

খানিকটা বেড়িয়ে শীলা বললে, আসুন এইখানটায় বসি একটু। ঘাসে ঢাকা ঢালু জমিটা গড়িয়ে সিধে ঝিলে নেমেছে—কত রকমের

পাখী কিচির-মিচির করছে চারদিকে—কেমন একটা নির্জ্জন অথচ প্রাণবন্ত আবহাওয়া ··কলকাতায় এসে পর্য্যন্ত এ দৃশ্য দেখিনি!

গোপেন বললে, বসবেন? কিন্তু বাইসন আর বন্য হরিণের ঘরটা এবং মেরু-ভাল্লুকের ঘরটা ঘুরে এলে হত না? দেখবার মতো জিনিষ ··

বিদ্রূপের হাসি হেসে শীলা বললে, মার্ক্সপন্থী নই বলে কি আমায় কচি খুকী ভাবছেন? বাইসন আর শাদা ভাল্লুক, জিরাফ আর হিপো-পটেমাস, ওয়ালরাস আর মান্ড্রিল বেবুন···এই নিয়ে আমোদ করার বয়স আছে আমার?

—তা নয়, তা বলছি না আমি। জন্তু-জগৎ একটা মস্ত অনুসন্ধানের জিনিষ ত · সেটা···

—সেটা দেখবে ফার্ষ্ট ইয়ারে পড়া নেকু খুকীরা। আমার বয়সে জীবনটা এতই খেলো নয় যে এইসব খেলনা দিয়ে তাকে ভোলানো যাবে।

—কিন্তু চিড়িয়াখানায় আসার জন্যে ঝোঁক ত আপনারই!

—সে জীব-জন্তু দেখার জন্যে নয়।

—তবে?

—বলছি। বসুন আগে এইখানটায়।

—সুধীনের ওখানে গিয়ে বসলেই ভালো হয় না? সেখানেও ত দিব্যি ঝোপ আছে।

হঠাৎ শীলা যেন কেমন উত্তেজিত হয়ে উঠলো। সে বললো, শ্রেণী-সঞ্জাত ও সংরক্ষিত স্বার্থ সম্বন্ধে বক্তৃতা শোনার প্রবৃত্তি আমার নেই। তার হাত থেকে পরিত্রাণ পাবো বলেই এখানে আসা এবং আপনাকে সঙ্গে নেওয়াও সেই জন্যেই।

নিজের অজ্ঞাতেই গোপেন চমকে উঠলো। সুধীনের কম্যুনিজম-এর বাতিক কি তাহলে শীলার পক্ষে দুঃসহ হয়ে উঠেছে? হয়ত সুধীন তার প্রতি ঔদাসীন্য করছে, হয়ত সে তার ন্যায় সঙ্গত স্বাধীন চিন্তার পথ রুদ্ধ

করে দিচ্ছে! সে সহৃদয়তার সুরে বললো, সুধীনের একটু পাগলামি আছে ঠিকই, কিন্তু ওর অন্তরটা সত্যিই ভালো।

—এতটা ভালো না হলেও চলে, খানিকটা মন্দ হলেই বা ক্ষতি কি? কিন্তু মানুষটা জ্যান্ত হওয়া চাই, সে ত আর বইয়ের পাতা নয় যে খুলে পড়া এবং ভাঁজ করে তুলে রাখাই তার পক্ষে যথেষ্ট হবে!

—বুঝলাম না ঠিক।

—কি করে বুঝবেন? ভালোবাসা বলে পৃথিবীতে একটা জিনিষ আছে, বোঝেন কি?

—কিছু কিছু বুঝি বৈকি!

—সেই পদার্থটি মানুষ পেতেও চায়, দিতেও চায়। কিন্তু দুটোরি একটাও সম্ভব নয় আপনার বন্ধুটিকে দিয়ে। উনি আগাগোড়া একটা আইডিয়া—মানুষের দেহে একটা কেতাবী মত—আর পাঁচটা জিনিষের মতো আমিও ওঁর সেই আইডিয়ার একটি বাহন।

গোপেন চুপ করে রইলো খানিক্ষণ। তারপর বললো, তাই ত! আচ্ছা বলবো ওকে আমি।

—কি বলবেন? ওরে বৌকে একটু ভালোবাসিস এই না?

—ঠিক ও-রকম করে হয়ত বলবো না, তবে জিনিষটা ঐ বটে।

—আপনি নিতান্তই নাবালক।

—কেন?

—কেন? এই সুন্দর দুপুর—এমন একটি নির্জ্জন নিরালা আসর—এর কোন আবেদনই নেই আপনার কাছে! স্ত্রীলোক এখনো আপনার কাছে স্বপ্ন······তার সঙ্গে মানুষ হয়ে মেশবার সহজ ভাবই আপনার জন্মায় নি!

আরো কি যেন বলতে যাচ্ছিল শীলা, কিন্তু হঠাৎ চুপ করে গেল।

গোপেন বললে, চলুন, এবার ওঠা যাক। আমার আবার একটা জরুরি কাজ আছে।

ওরা ফিরে এসে দেখলো, সুধীন একখানা বই নিয়ে আপন মনেই ডুবে আছে।

সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে গোপেন দেখলো, শীলা একটা ষ্টোভ ধরিয়ে কি রান্না করছে। সে গলা খ্যাকারি দিয়ে জানালে তার উপস্থিতি।

শীলা মাথায় ঘোমটা টেনে দিয়ে বললে, আসুন। উনি একটু আগেই বেরিয়ে গেছেন।

—যাবার ত কথা ছিল না কোথাও!

—কে এক ভদ্রলোক এসেছিলেন, তিনিই ডেকে নিয়ে গেলেন।

—ও, তা আপনি ত আছেন।

—আপনি ওঁর বন্ধু, আমি থাকলে আর লাভ কি?

—কেন আপনিও কি আমার বন্ধু নন?

শীলা দৃঢ়কণ্ঠে উত্তর দিলে, না। আমি মেয়েমানুষ, আপনি পুরুষ মানুষ···আমাদের দেশে এ ধরণের বন্ধুত্ব হয় না।

গোপেনের মুখের ওপর যেন সপাং করে একটা চাবুকের ঘা এসে পড়লো। সে বললো, কিন্তু আমার ধারণা ছিল, আপনি আমাকে বিশ্বাস করেন এবং···

—এবং কি?

—এবং কাল দুপুরে চিড়িয়াখানায় আপনার যে চেহারা দেখেছিলাম, সেটা আমার সম্পূর্ণ আলাদা মনে হয়েছিল।

—আলাদা চেহারা নিশ্চয়ই। কিন্তু কাল ত আর আজ নয়, সে দুপুর চলে গেছে—সে চেহারাও বদলে গেছে তারি সঙ্গে। আজ আমি অপরাপর বাঙালী ভদ্রপরিবারের বৌদেরই একজন···

—কিন্তু কাল কি আপনি আমায় কিছু বলতে চান নি? আমার

মনে হয়েছিল, এমন কিছু বলতে চেয়েছিলেন, যা ঠিক এই আদর্শের বিচারে সৎ বা সমীচীন নয়!

—নিশ্চয় চেয়েছিলাম। কিন্তু বলেছি ত, সে কালকের কথা—আজকের সঙ্গে তার কোনই সম্বন্ধ নেই। সেই প্রাকৃতিক আবহাওয়ার ভেতর, মনের সেই বিশেষ অবস্থার ভেতর, যা সত্য ছিল, আজ তা মিথ্যা—মহামিথ্যা।

—কিন্তু কাল যদি সেটা আমার দিক থেকে সমর্থন পেতো?

—তাহলে যা হত, তার জন্যে প্রস্তুত ছিলাম আমি। এমন কি, তারপর যদি তলহীন অন্ধকারে ডুবে যেতে হত, তাতেও আমি পেছুপা ছিলাম না।

গোপেন একটু চুপ করে রইলো, তারপর নেহাৎ আহাম্মকের মতোই বললো, আচ্ছা, আজ যদি সেই অবস্থাকে আবার ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করি ··আমি বেশ করে ভেবে দেখেই···

শীলা উঠে দাঁড়ালো, তারপর আঁচলটা বেশ করে কোমরে জড়িয়ে নিয়ে বললো, আপনি বুঝি ভেবেছেন, আমি ধর্ম্ম-কর্ম্ম, আচার-অনুষ্ঠান, কিছুই মানি না? আমি নিতান্তই একটা যাচ্ছে তাই?

—তা ভাবিনি। ভেবেছি, আপনার জীবনে কোথাও একটা ব্যর্থতা আছে, তা পূরণ করার সুযোগ যদি...

—বেরিয়ে যান আপনি এখুনি আমার বাড়ী থেকে—আর কোন দিন যেন আপনাকে না দেখি আমি এখানে। বিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে আপনি বন্ধুর সর্ব্বনাশ করতে চান? আপনাকে আমি পরীক্ষা করে দেখলাম! দেখলাম, আপনি অতি অসৎ, অতি বাজে, অতি অন্তঃসারশূন্য! এমন মানুষকে আমি ভদ্রলোক বলেই মনে করি না।

গোপেন আর একবার কি বলবার চেষ্টা করলো, কিন্তু শীলা তার আগেই ঘুরে দাঁড়ালো এবং বললো, আপনার সঙ্গে ভুয়ো তর্ক করার

সময় নেই আমার। একটু পরেই উনি ফিরবেন, জল-খাবার তৈরী করে রাখতে হবে!

কাল সাপ

মেয়েটি সামে দিয়ে দু'বার ঘুরে গেল। পূর্ণেন্দু যেন দেখেও দেখেনি। তিন বারের বার সে নিজেই এসে পূর্ণেন্দুর বেঞ্চিতে বসে পড়লো। কণ্ঠস্বরে প্রগাঢ় আত্মীয়তা ঢেলে সে বললো, কি, চিনতেই যে পারেন না!

পূর্ণেন্দু শক্ত হয়ে বললো, চিনতে কি আর বাকি আছে? হাড়ে-হাড়ে চিনেছি বলেই ত আর তাকাতে ভরসা পাইনি!

মেয়েটি বিশ্রীভাবে হাসলো একটু। তারপর মোলায়েম করে বললো, কি চিনেছেন বলুন ত?

বলবো, পূর্ণেন্দু বললো, তুমি একটি আস্ত.........কিন্তু আমাকে এ ভাবে ডোবানোর কি দরকারটা ছিল তোমার? আমি ত তোমার কোন ক্ষতিই করিনি। বরং বিশ্বাসই করে ছিলাম...

মেয়েটি খানিকক্ষণ চুপ করে রইলো। তারপর ম্লানমুখে বললো, আপনি ভুলে যাচ্ছেন কেন যে, আমাকেও একদিন একজন ডুবিয়ে গিয়েছিল, আমিও তার কোন ক্ষতিই করিনি? আপনার মতোই বিশ্বাস করেছিলাম তাকে!

পূর্ণেন্দুর গলা একটু চড়লো। চোখ পাকিয়ে সে বললো, তার জন্যে তুমি আমাকে ঠকাবে?

—নিশ্চয়, আপনাতে-তাতে তফাৎটা কি? আপনি না হয় কায়দায় পড়ে গেলেন তাই, নইলে ত তারই মতো ফাঁকতালে সরে পড়তেন,

আর মনে-মনে একটি গৃহস্থ মেয়ের সর্বনাশ করেছেন ভেবে আনন্দ পেতেন। বলুন, এই করতেন কি না?

—হয়ত করতাম

—তা হলেই বুঝুন! আপনিও এসেছিলেন ফাঁকি দেবার মতলবে, আমিও আপনাকে ফাঁকিই দিয়েছি।

—এই কি তোমাদের ব্যবসা?

—তা বৈকি। টাকার দামে যাদের ভালোবাসা বিক্রি করতে হয়, আর তাই দিয়ে পেটের ক্ষিদে মেটাতে হয়, তাদের কাছে আর কি আশা করেন?

পূর্ণেন্দু গম্ভীর রইলো কয়েক মিনিট। তারপর বললো, এইভাবে তুমি দেশের কত ক্ষতি করছো জানো? নিরীহ ভদ্রলোকের ছেলেরা দলে দলে পড়ছে তোমাদের ফাঁদে, আর চিরকালের মতো অধম হয়ে যাচ্ছে—বংশকে বংশ যাচ্ছে সাবাড় হয়ে।

মেয়েটি ব্যঙ্গ করে বললো, সেই নিরীহ ভদ্রলোকের ছেলেরা যদি মানুষ হত, তাহলে তাদের রোজগার করবার ক্ষমতা থাকতো, বিয়ে করবার সাহস থাকতো, স্ত্রী-পুত্র নিয়ে ঘর করার যোগ্যতা থাকতো। তা নেই বলেই মেয়েদেরকে করতে হচ্ছে নিজের পেটের চেষ্টা—যারা লেখাপড়া জানে, তারা কোন রকমে হয়ত ভদ্রভাবে চালাচ্ছে, কিন্তু যারা আমাদের মতো মুখ্যু, তাদের সামনে এ ছাড়া আর পথ কি আছে? মজা এই যে, যাদের কোন ক্ষমতা নেই, সেই জানোয়ারদের লোভটি আছে পুরো মাত্রায়—মেয়েমানুষের পেছু পেছু ঘোরা, আর ফাঁকি দিয়ে নিজের মতলব হাঁসিল করার কাজে তারা সবাই দড়ো। এরা আমাদেরও কি ক্ষতি করছে, দেখতে পাচ্ছেন না?

পূর্ণেন্দুর মুখে আর কথা এলো না। সত্যিই ত! জীবনযাত্রায় অব্যাহত আরাম ও স্বাচ্ছন্দ্যের অভাব হবে ভেবে যারা বিয়ে করে না,

অথচ ফাঁকি দিয়ে আত্মতৃপ্তির সুযোগ পেতে চায়, সে ত তাদেরই একজন। সে ত সত্যিই কোন দিন ভেবে দেখিনি এইসব মেয়েদের দিন কি ভাবে চলে! অথচ তাদের পেছু পেছু ঘুরে স্বল্প ব্যয়ের বিনিময়ে নিজেকে খুসী রাখতে চেষ্টা করেছে। মনে করেছে, বাইরে কেউ টের পেলোনা। এই অসংযম ও প্রতারণার জন্যে যদি একদিন মাশুল দিতে হয়ে থাকে, তাহলে সত্যিই কারুকে দোষ দেওয়া যায় কি?

ভাবতে ভাবতে পূর্ণেন্দুর মনটা সহানুভূতিতে আর্দ্র হয়ে উঠলো। সে বললো, যাক গে, যা হবার হয়েছে—অনেক কষ্টে আমি রক্ষা পেয়েছি। তোমাকেও পরামর্শ দিচ্ছি, যাতে সেরে উঠতে পারো, আর এ পথ ছেড়ে অন্য ভাবে দিন চালাতে পারো, সেদিকে নজর দাও। তোমার নাম কি বলেছিলে···রেণু, না?

—হ্যাঁ।

—বুঝেছো রেণু আমি কি বলছি?

—খুব বুঝেছি। কিন্তু আপনি ত জানেন না যে আমাকে ঘরভাড়া দিতে হয়, ভাত-তরকারি থেকে আরম্ভ করে কেরোসিন তেলটি পর্য্যন্ত পয়সা দিয়ে কিনতে হয়, আর সে পয়সা আমার জমিদারী থেকে আসে না, স্বামীও নেই যে সে দেয়······। মরতে মরতেও তাই গালে রং মেখে, আর ভঙ্গী-রঙ্গী করে কাপড় পরে, পথে, পার্কে, চায়ের দোকানে ঘুরে ঘুরে বেড়াতে হয়!

—এমন লোক কি কোনদিন পাওনি যে তোমার ষোল-আনা ভার নিতে পারে, খেতে-পরতে দিতে পারে, মান-সম্ভ্রম দিতে পারে? এমন একটিও···

—না, একদম না। সকলেই বলেছে বটে সে কথা, আশাও দিয়েছে ঢের—কিন্তু পরের দিন আর ফিরে আসেনি কেউ। শুনে শুনে এখন বুঝতে শিখেছি যে, এই ব্যবসায় খদ্দেরেরা এই রকমই বলে—এটা সত্যি নয়।

চোখ বুঁজে পূর্ণেন্দু তার কথা শুনতে লাগলো। হঠাৎ তার মুখ থেকে বেরিয়ে গেল একটি কথা। সে বললো, তোমার কথা শুনে মনে হয়, তুমি লেখাপড়া জানো। তোমার বাড়ী কোথায়? কি ভাবে এলে এই পথে?

রেণু একটু হাসলো। তারপর বললো, শুনবেন? বাবা ছিলেন স্কুলের মাষ্টার, ত্রিশ টাকা মাইনে পেতেন—উনিশ বছর পর্য্যন্ত মেয়ের বিয়ে দিতে পারলেন না, ওদিকে বছর বছর নিজের ছেলে হতে লাগলো। শেষে জুটলো এক কায়েত বড়লোকের ছেলে, মেয়ে এগিয়ে দিয়ে তার কাছ থেকে নানা ছুতোয় বাপ-মা টাকা আদায় করতে লাগলেন, অথচ সে যখন বিয়ে করতে চাইলো মেয়েকে, তখন বামনাই মাথা চাড়া দিয়ে উঠলো। চোখ রাঙিয়ে তাকে বিদেয় করলেন। সে গেল, কিন্তু যাবার আগে আমায় ফাঁসিয়ে গেল। চল্লিশ বছর বয়সে নতুন করে একটি ছেলে পেটে নিয়ে মা আমায় দূর দূর করে দিলেন পথে নামিয়ে, বাবাও যোগ দিলেন সঙ্গে। কেঁদে কেটে গিয়ে পড়লাম সেই ছোকরার কাছে—সেও সরাসরি দিল হাঁকিয়ে। তখন একজন দিলে আশ্রয়······তারপর তারও গেলো নেশা ছুটে, বিয়ে করে দিব্যি ভদ্রলোক হল। আমার জন্যে তখন খোলা রইলো একটি মাত্র রাস্তা—সেই রাস্তাতেই আপনার সঙ্গে দেখা।

পূর্ণেন্দু আর কি বলবে? আস্তে আস্তে সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়েলের বাগান বন্ধ হবার ঘণ্টা বাজছে। এবার উঠতে হবে। হঠাৎ হন হন করে সামনে দিয়ে যেতে যেতে একটি যুবক থমকে দাঁড়ালো, তারপর বক্রদৃষ্টিতে রেণুর দিকে তাকিয়ে কি-একটা ইঙ্গিত করলো। রেণুও আর কিছু না বলে উঠে পড়লো, তারপর অস্বচ্ছ অন্ধকারে তার পিছু নিলো।

পূর্ণেন্দু গভীর দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বললো, আর একটি বলি!

ঝড়

মেজো-বৌ সুশীলা কলতলায় বসে চায়ের বাসনগুলো ধুচ্ছে— হঠাৎ একটা নিমের ডাল চিবুতে চিবুতে দীনবন্ধু এসে উঠলেন। দীনবন্ধুর কানে পৈতে, কাছাটা সামনের দিকের কোমরে গোঁজা—এখনি স্নানান্তর থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়েছেন। বললেন, দেখি মেজো-বৌমা, একটু মুখটা ধুয়ে নিই আমি।

সুশীলা ছিল আনমনা। হঠাৎ দীনবন্ধুর সাড়া পেতেই আস্তেব্যস্তে উঠে দাঁড়ালো, তারপর গায়ে-মাথায় কাপড় চাপা দিতে দিতে প্রায় দৌড়েই রান্নাঘরের চাতালে গিয়ে দাঁড়ালো। ব্যাপারটার বিসদৃশতা দীনবন্ধুর মতো আলাভোলা লোকেরও নজর এড়ালো না। তিনি কিছু না বলে তাড়াতাড়ি মুখটা ধুয়ে নিলেন, তারপর ভিজে গামছাখানা নিংড়াতে নিংড়াতে ঘরে উঠে গেলেন। তাঁর মনে হল, জীবনে এমন অপদস্থ আর কোনদিন হননি কারুর কাছে। গুম হয়ে বসে রইলেন তিনি খবরের কাগজখানা হাতে নিয়ে।

নয়নতারা এলেন চায়ের কাপ নিয়ে। পেয়ালাটা টেবিলে নামিয়ে দিয়েই চলে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে বললেন, হ্যাঁ, তোমার যেন দিন দিন বুদ্ধি-আক্কেল সব লোপ পাচ্ছে! ভাদ্রবৌ কলে রয়েছে—বলা নেই কওয়া নেই, হুড়-মুড় করে ঢুকে পড়লে গিয়ে!

যে ব্যাপারে দীনবন্ধুর মনেই জমে উঠেছিল তীব্র একটা নালিশ, ঠিক সেই ব্যাপার নিয়ে উল্টো পক্ষ থেকে নালিশ এলো—দীনবন্ধু প্রথমটা থতমতো খেয়ে গেলেন। তারপর স্থির কণ্ঠে বললেন, কেন, তাতে হয়েছে কি? সমাজ-ধর্ম্ম সব রসাতল গেছে?

নয়নতারা বললেন, তা যাক না-যাক, দৃষ্টিকটু ত! ভাদ্দর বৌ-এর লোকে মুখ দেখে, না তার সঙ্গে কথা বলে? এরপর পাঁচজন পাঁচকথা বললে, তখন কার মুখ চাপা দেবে?

এবার দীনবন্ধুর ধৈর্য্যচ্যুতি হল। তিনি বললেন, পাঁচজনের কথার আমি ধার ধারি না। কিন্তু উপস্থিত ত দেখছি, বলছে একজন, আর সে জন অন্য কেউ নয়, তুমি।

নয়নতারাও আগুন হয়ে উঠলেন, বললেন আমি? না জেনেশুনে অমন দুষী করো না আমাকে। তোমার ভাই-ই বলেছে—বুঝলে!

—কি বলেছে?

—বলেছে, দাদা কি যে করেন সব! একটু বুঝিয়ে বলো বৌদি, সুশী বড্ড রাগ করছিল, বলছিল, ওদের বাড়ীতে ও-সব রেওয়াজ নেই।

দীনবন্ধু শুধু বললেন, হুঁ। তারপর নিঃশব্দে চায়ের পেয়ালাটা শেষ করে, বেরিয়ে গেলেন বাজারের থলিটা নিয়ে।

কি আনতে হবে না-হবে জিজ্ঞাসা না করে বাজারে যাওয়া কস্মিন কালেও দীনবন্ধুর অভ্যাস নয়। নয়নতারা বুঝলেন, রাগ হয়েছে তাঁর। কিন্তু রাগের যে কি কারণ হল, তা বুঝলেন না তিনি। নিজে থেকেই হেঁকে বললেন, ট্যাংরা মাছ এনো না যেন, ঠাকুরপোর পছন্দ হয় না। দরজার ওপিঠ থেকেই উগ্র চোখে দীনবন্ধু একবার ফিরে তাকালেন, তারপর আবার রাস্তামুখো পা দুটো চালিয়ে দিলেন।

বাজারটা রান্নাঘরের রোয়াকে নামিয়ে দিয়ে কলে হাত ধুতে এসে দীনবন্ধু দেখলেন, নয়নতারা একখানা বড় গামছা পরে আর একখানা ছোট গামছা গায়ে চাপা দিয়ে, ঘটি ঘটি চৌবাচ্চার জল মাথায় ঢালছেন, আর মেজো ভাই মুরারী কাছে দাঁড়িয়ে ব্রাস দিয়ে দাঁত মাজছে। সেই সঙ্গে ফিস ফিস করে কি যেন বলছে!

দীনবন্ধু বোঁ করে ঘুরে নিজের ঘরে এসে বসলেন এবং ফেলে-দেওয়া

খবরের কাগজটা কুড়িয়ে নিয়ে, আর একবার তাতে মনঃসংযোগের চেষ্টা করলেন। কিন্তু বৃথা, মনটা তাঁর এমনই খিঁচড়ে গেছে যে তাকে আর কিছুতেই গুছিয়ে এক করতে পারলেন না।

ঘরের মেঝেয় একগাদা বই-শেলেট বিছানো, তার কাছেই হাত-পা-ভাঙা গোটা দুয়েক মেটে পুতুল পড়ে রয়েছে। একধারে খানিক কালি ঢালা, তার ওপর গুটিকতক মুড়ি। প্রতিদিনই এসব জিনিষ থাকে, কিন্তু আজ যেন এ জিনিষগুলো দীনবন্ধুর চোখে হঠাৎ অসহ্য ঠেকলো। তিনি হুঙ্কার দিয়ে ডাকলেন, পটলী।

নয়নতারা জামা-কাপড় বদলে ঘরে উঠে এলেন। বললেন, পটলী ইস্কুলে চলে গেছে, ওদের আজ পরীক্ষা। রান্না হয়নি এখনো, দুটো চিঁড়ে দিলাম তাড়াতাড়ি।

দীনবন্ধু বললেন, পরীক্ষা দিয়ে ত বাবার মাথা কিনবেন। ঘরটা এমন ভূতের বাসা করে রেখেছে সকলে মিলে যে এর ভেতর পা দেবারই উপায় নেই। কৈ আর কোন ঘর ত এরকম দেখিনা! সব ত দিব্যি ফিটফাট! সেগুলোও ত তোমাকেই করতে দেখি···

নয়নতারা হেসে বললেন, কি করি, ঠাকুরপো যে অপরিষ্কার কিছু দেখতে পারে না!

—আর আমি সবই পারি—কেমন? আমি বুঝি মানুষই নই, না?

—মানুষ নও কেন? তুমি বাড়ীর কর্ত্তা তোমার কি আর সব তাতে ও রকম অসহ্য হলে চলে?

স্বভাবত শান্ত প্রকৃতির মানুষ দীনবন্ধু বেশী কথা বলতে পারেন না। তিনি চুপ করলেন। কিন্তু তাঁর মুখের ভাব ও চোখের দৃষ্টি দেখে নয়নতারা বুঝলেন, তাঁর মনে কোথায় যেন একটা তীব্র অসন্তোষ জড়ো হয়েছে—যা থেকে ঠিকরে ঠিকরে আসছে এই সব ছোটখাটো বিপত্তি।

সাদা-বুদ্ধির মানুষ নয়নতারা ভাবলেন, বিষয়ান্তরের অবতারণা

করলেই দীনবন্ধু সহজ হয়ে আসবেন। তেল আর গামছা নিয়ে তিনি আর এক ফাঁকে তাই ঘরে এলেন। কণ্ঠস্বরে গোপনীয়তা সৃষ্টি করে বললেন, জানো, ঠাকুরপো কি করেছে? সস্তায় কে একজোড়া রুলি বেচে ফেলছিল, মেজো বৌ-এর জন্যে তাই কিনে এনেছে। এখন আমাকে বলছে, দাদাকে বলো বৌদি যে এমাসে আমি কিছু দিতে পারবো না।

দীনবন্ধু ছিলেন বসে, প্রবল উত্তেজনায় উঠে দাঁড়ালেন। তারপর উন্মাদের মতো চীৎকার করে বললেন, কেন, দাদা কি চোর-দায়ে ধরা পড়েছে যে আজন্ম ওঁদের ষোল-আনা বোঝা বইবে, আর ওঁরা কেউ পরিবারের গহনা করবেন, কেউ ব্যাঙ্কে টাকা জমাবেন? আমার এটা বিনা মাশুলের হোটেল নাকি?

নয়নতারা প্রথমটা চমকে উঠলেন। তারপর স্থির সংযত কণ্ঠে বললেন, মায়ের পেটের ভাই, ছোট ভাই, তাদের দুটো খেতে-পরতে দাও, এ আর এমন কি বাহাদুরী করো যে তাই নিয়ে এমন খিটকেল করছো?

দীনবন্ধুর তখন হিতাহিত জ্ঞান লোপ পেয়েছে। তিনি বললেন, ধারে-দেনায় আমি জেরবার হয়ে গেছি। ওরা সকলেই ভালো রোজগার করেন, অথচ একটি পয়সাও ঠেকান না, সকলেই আপন আপন আখেরের ব্যবস্থা করে যাচ্ছেন, আর আমি ব্যাটা ঘাড় কাত করে খালি জোঁয়ালই টেনে চলেছি চিরদিন। কেন? কিসের এত জবরদস্তি আমার ওপর?

—জবরদস্তি কি আবার এতে? নিজে না খেয়ে নিজে না পরেই লোকে ছোট ভাইদের মানুষ করে। ওতে গরিমার কিছু নেই। ওরা একটু ভালো খাওয়া-পরা নইলে পারে না, এই নিয়ে তোমার এত আক্রোশ? ছি-ছি!

—আক্রোশ? হ্যাঁ আক্রোশই! হবে না কেন তাই শুনি? আমি

ওসব আর সহ্য করবো না। বলে দিয়ো তুমি—ওঁরা যেন আজই যে যার পথ দেখে নেন!

নয়নতারা রণে ভঙ্গ দিতে পারলেই বাঁচে এখন। কারণ মুরারীর স্নান হয়ে গেছে, এবার তাকে ভাত দিতে হবে। তিনি বললেন, থামো, থামো, সব বাড়ীতে রয়েছে—শুনতে পেলে ভাইয়েদের মনে কি হবে, আর নতুন বৌটিই বা কি ভাববে বলো ত!

দীনবন্ধুও ক্লান্ত হয়েছেন। তিনি উঠে জানালাটা খুলে দিলেন, তারপর নিস্তেজ কণ্ঠে বললেন, আচ্ছা, আমি আর কিছু বলছি নে—কিন্তু আজ থেকে তুমি যদি ওদের সাম্নে বেরোও, কি ওদের সঙ্গে কথা কও, তোমার সঙ্গে আমার আর কোনই সম্বন্ধ নেই।

—এ কথার মানে?

—মানে খুব সহজ। ওদের স্ত্রীর সাম্নে আমি একটু গেলেই যদি তাতে মহাভারত অশুদ্ধ হয় ত আমার স্ত্রীকে গামছা পরে ওদের সঙ্গে ইয়ার্কি দিতে দেখলে, আমারও প্রাণ আহ্লাদে নৃত্য করে না জানবে।

নয়নতারার সমস্ত শরীর পাক দিয়ে উঠলো। তিনি বললেন, তুমি পাগল হয়েছ—তাইতেই তোমার এ রকম মতিচ্ছন্ন হয়েছে। দেওর—দেওর হল ছোট ভাইয়ের চেয়েও আদরের জিনিষ মেয়েদের···

—আর ভাশুর? সে শালাই হল আদৎ গরুচোর, না? কিন্তু মনে রেখো, স্বামীর চেয়ে এক বছরের ছোট ভাইও দেওর, আর এক বছরের বড় ভাইও হয় ভাশুর!

নয়নতারা এবার বোধ হয় বুঝলেন দীনবন্ধুর আসল ঘা-টা কোথায়—মুখ টিপে একটু হেসে নিঃশব্দে তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

ঘটনা

শ্যামবাজারের মোড়ে অনেক দিনের পুরানো চায়ের দোকান—তারা কেবিন। ছোট হলেও দোকানটি বেশ সাজানো গোছানো, আর একটু আভিজাত্যও আছে তার। আশে পাশের বিশিষ্ট ভদ্রলোক অনেকেই তার খরিদ্দার। সকালে বিকালে, বিশেষতঃ বিকালে এখানে মস্ত একটা আড্ডা জমে—রাজনীতি, সমাজ, ধর্ম্ম, অনেক কিছু নিয়েই তর্কাতর্কি চলে।

রসিকবাবুও এর একজন নিয়মিত খরিদ্দার। পাড়ার 'ভুবনমোহিনী বিদ্যালয়ে' মাষ্টারী করেন—স্কুলের ছুটির পর ছাতাটি বগলদাবায় নিয়ে রোজই তিনি এসে ঢোকেন তারা কেবিনে—কথাবার্ত্তা বেশী বলেন না, নিঃশব্দে এক পেয়ালা চা গলধঃকরণ করেন, তারপর দেহ ও মনের ক্লান্তি দূর হলে, আস্তে আস্তে উঠে বাড়ী মুখে রওনা দেন। বীডন ষ্ট্রীটে বাড়ী, এটুকু রাস্তা হেঁটে যাওয়া তার বরাবরের অভ্যাস। বাসের পয়সা বাঁচে, একটু ব্যায়ামও হয়।

সেদিন সন্ধ্যার আগে রসিকবাবু এসে ঢুকলেন তারা কেবিনে। অন্যান্য দিনের তুলনায় মুখটা তাঁর বেশ গম্ভীর। ছুটির পর ঘণ্টা দুই সমানে তর্ক চালিয়েছেন সেকেণ্ড পণ্ডিত কৃষ্ণনারায়ণ তর্কতীর্থের সঙ্গে, অবশেষে খানিকটা রাগারাগি করে মধ্যপথেই রণে ভঙ্গ দিয়ে বেরিয়েছেন। পণ্ডিত মশায়কে অন্ধ নিয়তিবাদের আওতা থেকে মুক্ত করতে পারেন নি, উল্টে তাঁর মার্জ্জিত আর্য্য-ভাষার খোঁচায় ক্ষতবিক্ষত হয়েছেন—মনটা তাঁর তাই ভালো নেই।

বসে বসে রসিকবাবু চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিচ্ছেন, আর ভাবছেন, একটা আকাট অবৈজ্ঞানিক লোকের সঙ্গে তর্ক করে অযথা এতটা সময় নষ্ট

না করে, তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরলে কোয়াটার্লির খাতা গুলো দেখে ফেলা যেতো। দীনবন্ধু বাবুর বৈঠকখানায় বসে দু'বাজী তাস খেললেও এর চেয়ে বেশী কাজ দেখতো। খান দুই ব্যাকরণ আর অলঙ্কারের বই ছাড়া জীবনে কোন কিছুই যে পড়ার দরকার বোধ করেনি, এমন একটা অপদার্থ গোঁড়াকে বোঝাতে যাওয়ার কি কোন মানে হয়? আর সে বুঝলেই বা তাতে পৃথিবীর যায়-আসে কি?

বসে বসে ভাবছেন, হঠাৎ সবিস্ময়ে দেখেন রসিকবাবু যে তাঁর টেবিলের এক কোণায় পড়ে রয়েছে চওড়া একটা পুরানো মনিব্যাগ—ওপর থেকে দেখেই বোঝা যায়, ভেতরটা তার খালি নয়। আগের খরিদ্দার কেউ অসাবধানে ফেলে গেছেন আর কি!

রসিকবাবুর চিন্তাস্রোত বাধা পেলো। মনিব্যাগটির ওপর হাত চাপা দিয়ে তিনি ভাবতে লাগলেন—এখানে যাঁরা আছেন, তাঁদের কারুর নয়, আসল মালিক যিনি, তাঁরো সন্ধান হওয়া কঠিন—আর দোকানীর হাতে জিম্মা রাখলে ত নির্ঘাতই খোয়া যাবে জিনিষটা। এ-অবস্থায় কি করা যেতে পারে? বুদ্ধি খুলে গেল—খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিলে কেমন হয়? 'মনিব্যাগ পাওয়া গিয়াছে—উপযুক্ত প্রমাণ সহ নিম্ন ঠিকানায় সন্ধান করুন'।

হ্যাঁ, এটাই বেশ উপায়! নিজের নাম এবং মহত্বও প্রচার হবে, আবার বিপন্ন ভদ্রলোকটিও তাঁর হারানো ব্যাগ ফিরে পেতে পারবেন।

সাত-পাঁচ ভেবে ব্যাগটা তিনি সকলের চোখ এড়িয়ে পকেটে পুরে ফেললেন।

* * * *

দু'মিনিট যেতে না যেতেই এক বুড়ো ভদ্রলোক হন্তদন্ত হয়ে এসে হাজির।

রসিক বাবুর টেবিলে হাত রেখে তিনি বললেন, আমার ব্যাগ? ভুলে টেবিলের ওপর ফেলে গেছি—এই দশ মিনিট আগে!

রসিকবাবু পড়লেন বিপদে। যদি বের করে দেন, তাহলে পকেটে পোরার অপরাধে তিনি নিজেই চোর হয়ে দাঁড়ান, না দিলে আসল মালিক ফাঁকে পড়েন। কিন্তু ভাববার সময় নেই, চট করে ঠিক করে ফেললেন, যা হয় হক, তিনি বলবেন না।

বললেন, ব্যাগ? কৈ দেখিনি ত!

ভদ্রলোক সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে একবার তাকালেন তাঁর দিকে। তারপর আশেপাশে ওপরে নীচে আঁতিপাঁতি করে খুঁজতে লাগলেন। রসিকবাবুও তাঁর সঙ্গে খোঁজায় যোগ দিলেন। কিন্তু ব্যাগ রয়েছে তাঁর পকেটে, পাওয়া যাবে কি করে?

বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি ক্লান্ত হয়ে একটি চেয়ারে বসে পড়লেন, আর বিড় বিড় করে বলতে লাগলেন, দুনিয়া চোরে ভরে গেছে! চা-টি খেয়ে বেরিয়েছি, দশমিনিটও হয়নি—এরি মধ্যে কোন ব্যাটা ব্যাগটি সটকে ফেলেছে! জামা জুতো পরে বেরুলেই হয় না···সব চোর, সব চোর!

একটু দম নিয়ে তিনি আবার বললেন, এক-আধটা পয়সা নয়···দশ দশটা টাকা, তারি সঙ্গে কিছু মোটা রেজকি। নে কোন শালা নিবি... বামুনের ধন নিয়ে ক'দিন ভোগ করিস দেখবো! আজই মরছি না আমি!

রসিকবাবুর মনে হল, ভদ্রলোকটি যেন তাঁকে লক্ষ্য করেই কথাগুলো বলছেন। তাঁরও প্রাণটা হায় হায় করতে লাগলো। কিন্তু বুদ্ধি-বিপাকে এমনি অবস্থা ঘটিয়েছেন তিনি যে জেনেশুনেই তাঁকে ভদ্রলোকের ব্যাগটি গাফ করে বসে থাকতে হচ্ছে! বের করে দিলে গরীবের উপকার হয়—কিন্তু একবার বের করলে আর রক্ষা আছে? দোকান শুদ্ধ লোক তাঁকে টুকরো টুকরো করে ফেলবে।

বুড়া ভদ্রলোকটি ক্রমেই যেন মরিয়া হয়ে উঠলেন। চক্ষু-লজ্জা ছেড়ে তিনি সোজাসুজি মুখুজ্যে মশায়কে তাক করেই বলতে আরম্ভ করলেন, ভবিষ্যযুক্ত হয়ে বসে থাকলে, আর চোখ বুঁজে চুরুট ফুঁকলে শুনবো কেন? ওসব ফিকির ঢের দেখেছি!

পাশের একটি ভদ্রলোক তাঁকে ধমকে বললেন, নিজে অসাবধান হয়ে কোথায় হারিয়েছেন. এখন খামাখা একজন ভদ্রলোককে চোর বানাচ্ছেন। আচ্ছা লোক ত আপনি!

বুড়ো ভদ্রলোকটি বললেন, অসাবধান? অসাবধান কে না হয় মশায়? কিন্তু অসাবধান হলেই অম্নি পরের জিনিষ পকেটস্থ করতে হবে, এটা কোন দেশী সভ্যতা?

সেই ভদ্রলোকটী জবাব দিলেন, তা বলে সবাই চুরি করে?

ছোকরা গোছের একটি বাবু বললেন, আপনিই বা এমন জোর দিয়ে বলছেন কেন?

শেষটা খদ্দেরদের মধ্যে এই নিয়ে বেশ একটু বকাবকি বেধে গেল। যাঁকে নিয়ে ঝগড়া, সেই রসিকবাবু কিন্তু মহাদেবের মতো কড়ি কাঠের দিকে চেয়ে নির্লিপ্ত ভাবে চুরুট টানছেন, আর ভাবছেন, কি করা যায়?

দোকানী ব্যাপার স্যাপার দেখে আস্তে আস্তে রসিকবাবুর কাছে এসে দাঁড়ালো।

সবিনয়ে বললো, যদি কিছু মনে না করেন ত আপনার দামটা স্যার...

রসিকবাবু কেমন যেন বিভ্রান্ত হয়ে গিয়েছিলেন। হঠাৎ চমকে উঠে বললেন, হ্যাঁ, এই যে।

বুকপকেটে হাতপুরে নিজের ব্যাগটি বার করতে যাবেন, আর সঙ্গে সঙ্গে বুড়ো ভদ্রলোকটির পুরানো ব্যাগটি ঝপাৎ করে পড়ে গেল টেবিলের ওপর। মনের ভুলে সেটাও যে বুক পকেটেই রেখেছিলেন, এ আর তাঁর

হুঁস ছিল না! বুড়ো লোকটি নেকড়ে বাঘের মতো লাফিয়ে উঠলেন—দেখুন, মশায়রা, ঐ দেখুন, আমার ব্যাগ! আপনারা খুলে মিলিয়ে নিন, আমি বলে যাচ্ছি, ওর ভেতর কি কি আছে। আমি আগেই ধরেছিলাম ··

রসিকবাবু একদম ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলেন! ভয়ে আর লজ্জায় তাঁর মাথা পেট গুলিয়ে উঠলো। কি করবেন, কি বলবেন, কোথায় যাবেন? হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে তিনি দৌড়ে বেরিয়ে যেতে চেষ্টা করলেন। চারিদিক থেকে হৈ-হৈ করে লোক ঘিরে ফেললো! সঙ্গে সঙ্গে চীৎকার চোর, চোর, মার, মার!

তারপর কি হল আর না বললেও চলে। বিনা অপরাধে, নেহাৎ অবস্থার বিপাকেই যে মানুষ সময় সময় কত বড় বিপদে পড়তে পারে, এই ঘটনা হল তার একটি জ্বলন্ত প্রমাণ।

সৌভাগ্যের বিষয়, তাঁর এই বিপত্তির খবর চেনা পরিচিত কেউ জানতে পারেনি। পারলে অন্ততঃ সেকেণ্ড পণ্ডিত মশায় আর একবার অদৃষ্টবাদের পক্ষে ওকালতী করতেন!

শুভাকাঙ্ক্ষী

অমলেন্দু বাড়ী ঢুকেই হুড়মুড় করে সদর দরজাটি বন্ধ করে দিলেন। তারপর কোন দিকে না তাকিয়েই পাঁই পাঁই করে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে গেলেন।

অমলেন্দুর স্ত্রী ক্ষণপ্রভা সদরের কলে দু-চারটে কাপ-ডিস ধুচ্ছিলেন। স্বামীর কাণ্ড দেখে অবাক হয়ে তিনিও তাঁর পিছু পিছু ওপরে উঠে এলেন। দেখলেন, অমলেন্দু একটা চেয়ারে বসে হাঁপাচ্ছেন, আর জানলা দিয়ে রাস্তায় খালি কি দেখছেন।

তিনি বললেন, কি হয়েছে? অমন করছো কেন?

অমলেন্দু বললেন, বলছি, আগে চা দাও। বাপরে, বুক ঢিপ ঢিপ করছে!

ক্ষণপ্রভা ব্যস্ত হয়ে বললেন, কেন, কেন, ব্যাপার কি?

—ব্যাপার সাংঘাতিক, বলছি সব। কিন্তু চা কৈ? গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে, দৌড়ে এসেছি প্রায় এক মাইল।

ক্ষণপ্রভা ঠাকুরকে চা আনতে বললেন, তারপর একখানা হাত-পাখা নিয়ে হাওয়া করতে লাগলেন। ভয়ে আর দুশ্চিন্তায় তিনি অস্থির হয়ে উঠেছেন। কিন্তু অমলেন্দু যেন কিছুতেই আসল ব্যাপারটা ভাঙতে চান না!

চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে আর জানলা দিয়ে রাস্তার দিকে তাকাতে তাকাতে অমলেন্দু বললেন, উঃ কি বিপদেই না পড়েছি!

—গোণ্ডা নয় ত? কেউ মারতে-টারতে আসে নি ত?

—গোণ্ডাই। প্রাণে নয়, পকেট মারবার চেষ্টায় আছে।

—সে কি ?

—আর বলো কেন ? এ-পাড়ায় এসে ইস্তক পিছু নিয়েছে—অফিসে, ক্লাবে, সিনেমায়, বাজারে, যখন যেখানে যাবো, পিছু পিছু যাবে, আর কেবলি বলবে, কবে আছেন কবে নেই, জীবনের ওপর ভরসাটা কি ? পরিণামটা একবার ভাবুন স্যার।

—বলো কি ? মেজোমামা ত পুলিসের বড় চাকরে, তাঁকে তাহলে জানাতে হয় ! নইলে কোনদিন শেষটা···

অমলেন্দু হাসলেন, তারপর বললেন, পুলিশ তাকে ধরবে না। সে যে এমনে বেশ ভদ্রলোক—দিব্যি ফিটফাট চেহারা, ভালো পোষাক পরে, হাতে চামড়ার ব্যাগ নিয়ে বেড়ায়। আবার চুরুট খায়।

ক্ষণপ্রভা ব্যাকুল হয়ে বললেন, তা সে কি চায় তোমার কাছে ?

—চায় পলিসি করতে।

—পলিসি কিসের ? আমরা সাতেও নেই, পাঁচেও নেই, আমরা কার পলিসির ধার ধারি ?

—তা সেই গোঙাটাই জানে। আমার কিন্তু প্রাণ ওষ্ঠাগত করে তুলেছে। পথে বেরুলেই গা ছম ছম করে—ঐ বুঝি এলো। আর মজা এই যে ভাববামাত্রই দেখতে পাই, মূর্ত্তিমান হন হন করে এগিয়ে আসছে। কি গেরো বলো ত !

ক্ষণপ্রভা বললেন, এ ত ভালো কথা নয়। আমি আজই মেজো মামাকে খবর দিচ্ছি। লোকটাকে তুমি চিনিয়ে দিতে পারবে ত ?

—তা দিতে পারবো, কিন্তু ঐ যে বললাম, পুলিশ ওকে কিচ্ছু বলবে না। এজেন্টকে কি কেউ কিছু বলে ?

—এজেন্ট ? তবে যে বললে গোঙা ?

—গোঙাই ত। বিনা কারণে যে লোকের ক্ষতি করে, তাকেই ত লোকে গোঙা বলে, আর বিনা কারণে যে লোকের উপকার করে,

আর তাই করবার জন্যে দিন নেই, রাত্রি নেই, খালি পায়ে পায়ে ঘোরে, তাকে কি বলে ?

ক্ষণপ্রভা এতক্ষণে নিশ্চিন্ত হলেন। বললেন, রক্ষে হক। আমি ত ভয়েই সারা হয়ে গিয়েছিলাম।

অমলেন্দু চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে শুধু মুখ টিপে একটু হাসলেন। ভাবখানা এই যে কেমন ঠকিয়েছি!

ক্ষণপ্রভা বললেন, তুমি চা খাও। আমাকে হৈমবতী কেন ডাকছে শুনে আসি।

দু'মিনিটের মধ্যেই ফিরে এসে তিনি বললেন, হৈমর স্বামী একটু তোমার সঙ্গে দেখা করতে আসছেন। পাশাপাশি থাকা, অথচ চেনা-শোনা নেই—এটা কি ভালো দেখায় ?

অমলেন্দু সিধে হয়ে বসলেন। ঘরে এসে ঢুকলেন যিনি, তাঁকে দেখবামাত্র কিন্তু মগজে তাঁর দপ করে আগুন জ্বলে উঠলো!

তিনি চীৎকার করে বললেন, আপনাকে না হাজার বার বলেছি, আমি করবো না, করবো না, তবু আপনি আমার পেছুনে ঘুরবেন ? শেষটা স্ত্রীকে দিয়ে সুপারিশ করিয়েছেন আপনি ?

ভদ্রলোক হেসে বললেন, কি করি স্যার ? আপনার স্ত্রী অনেক ধরাধরিতে রাজী হলেন—বললেন, আপনার নামে পলিসি একটা করাবেন দু-হাজার টাকার। তাইতেই···

অমলেন্দু অবাক হয়ে বললেন, অ্যাঁ! আমার স্ত্রীকে ধরে ভেতরে ভেতরে কাজ গুছিয়ে রেখেছেন, অথচ আমাকে বিন্দু-বিসর্গও জানতে দেন নি, আপনি ত সোজা লোক নন মশায়!

—কি করি বলুন ? আপনার না হয় পালালে চলে, আমার ত তা চলে না। আমার যে এতেই রুটি।

—কিন্তু এর পর ত আপনি পালাবেন, আর আমিই মরবো বাঁধা পড়ে—বছরের পর টাকা টেনে চলতে হবে।

—আজ্ঞে হ্যাঁ, এই ত এর নিয়ম। কিন্তু এর পর যখন মেয়ের বিয়ের, নয়ত ছেলের পরীক্ষার সময় থোক টাকাটি হাতে পাবেন, তখন কি দয়া করে আমাকে মনে করবেন একবারও?

অমলেন্দু চোখে বুঁজে চা খেতে লাগলেন। অর্থাৎ অনন্যোপায় হয়েই এবার ভাগ্যের হাতে আত্মসমর্পণ করলেন!

ক্ষণপ্রভা বললেন, তাহলে আপনি তাড়াতাড়ি ফর্ম ফিল-আপ করিয়ে নিয়ে মেডিক্যাল এগজামিনের ব্যবস্থাটা করে ফেলুন। দেখছেন ত কি রকম মানুষ—এখুনি আবার বেঁকে বসবেন হয়ত!

ভদ্রলোক তাড়াতাড়ি কাজ সেরে নিয়ে বেরিয়ে গেলেন।

অমলেন্দু গম্ভীর হয়ে বললেন, বুঝেছি, হৈমবতীদের কাছে উঠে আসার তাগিদ এই জন্যেই। বেশ, বেশ, টাকা তুমিই দিও—আমি ওর কিচ্ছু জানি না। অন্যের স্বামীকে ক্লেশ দেবার জন্যে তুমি নিজের স্বামীকে ক্লেশ দাও—বেশ স্ত্রী যাহক!

ক্ষণপ্রভা ফিক করে হেসে বললেন, এখন চান করে নাও ত। বেলা যে এদিকে দশটা বাজে!

ভাবখানা এই যে আমিও কেমন ঠকিয়েছি!

মাসতুতো ভাই

চশমাটা চোখে পরিয়ে দিয়ে ডাঃ সরকার বললেন, বস্থন, আপনাকে আর একটু উপদেশ দিতে হবে।

চোখ পরীক্ষার ফী এবং চশমার দাম মিটিয়ে দিয়ে উঠছিলাম। অবশিষ্ট উপদেশটি শুনবার জন্যে আবার বসতে হল।

ডাঃ সরকার বললেন, দেখুন, চশমা নিলেন, চোখের হাঙ্গামাটা আর থাকবে না। কিন্তু দাঁতের কথাটাও ভুলবেন না। অনেক সময় দাঁতের গোলযোগ থেকেই চোখের বিভ্রাট দেখা দেয়—অথচ জিনিষটা ঠিক বুঝতে পারা যায় না, বাইরে কোন অসুখ···

ভীত হয়ে বললাম, তাহলে কি আবার দাঁত তোলাতে হবে?

ডাঃ সরকার হেসে বললেন, তাতে আর ভয় কি? এমন ওষুধ আছে, যা দিয়ে দাঁত তুললে আপনি টেরও পাবেন না। তবে কিছু খরচ আছে—তা সুস্থ হয়ে বাঁচতে হলে খরচ না করে আর উপায় কি বলুন?

বলবো আর কি? ইতিমধ্যেই তিরিশ টাকা খরচ হয়ে গেছে, এর ওপর আবার যদি দাঁত তোলাতে হয়, তাহলে যন্ত্রণায় না হক, খরচের ধাক্কাতেই মারা পড়বো।

বললাম, তা আমার কি আসল অসুখ দাঁতে?

ডাক্তার পাইপটা দাঁত দিয়ে চেপে ধরে উদাস আলস্যের সঙ্গে বললেন, হতে পারে। আমার ত মনে হয় তাই।

বিরক্ত হয়ে বললাম, গোড়ায় যদি বলতেন, তাহলে দাঁতই···

ডাক্তার পাইপটা হাতে নিয়ে বললেন, আহা-হা কথাটা বোঝেন না কেন? দাঁত দেখালেই কি সব ল্যাঠা চুকতো? দাঁত থেকে শুরু হলেও, ব্যারামটা চোখে এসে ইতিমধ্যে আলাদা একটা চোখের অসুখেই

দাঁড়িয়েছে যে! তার চিকিৎসা করাতে হবে না? নইলে চোখই যাবে। তাই চোখটা আগে ঠিক করে দিলাম।

নার্ভাস হয়ে বললাম, আর দাঁত?

ডাক্তার অমায়িক হাসি হেসে বললেন, এবার সেটা দেখান। নইলে শেষ পর্য্যন্ত বিপদে পড়বেন।

মুখ গোমড়া করে বসে রইলাম। মনে হল ডাক্তারের কথাই ঠিক। নিশ্চয় দাঁতে কোন ব্যারাম রয়েছে—মধ্যে মধ্যে দাঁতের গোড়া কনকন করে, সেদিন সকাল বেলা ওপর পাটির দাঁত দিয়ে অল্প একটু রক্তও পড়েছিল, এখনো যেন কষের দিকটা কি রকম চিনচিন করছে, এ সব কি জন্যে? ভেতর ভেতর একটা রোগই হয়েছে নিশ্চয়, টের পাইনি, অথচ তা আমার চোখ নষ্ট করেছে, কে জানে হয়ত কানকেও শেষ পর্য্যন্ত পাকড়াও করবে।

ডাক্তার আমার অবস্থাটা বোধহয় বুঝলেন। বললেন, তা আমার জানা একজন ডেণ্টিষ্ট আছেন, ডাক্তার চ্যাটার্জ্জী, খুব বিশ্বাসী লোক, তাঁর চার্জ্জও কম। যদি মনে করেন···

কি আর করবো? ঠিকানা নিলাম এবং ছোট্ট একটি নমস্কার করে বেরিয়ে পড়লাম।

* * * *

ডেণ্টিষ্ট ডাক্তার চ্যাটার্জ্জীর চেম্বারে যখন হাজির হলাম, তখন তিনি আর একটি ভদ্রলোকের দু'পাটি কৃত্রিম দাঁত ফিট করাচ্ছেন। আমাকে সামনের বেঞ্চিতে অপেক্ষা করতে হল।

আমি যেমন আয়নায় দেখে নূতন চশমা পছন্দ করেছিলাম, তিনি ঠিক তেম্নি আয়নায় নূতন দাঁত পছন্দ করছেন।

সব শেষে যখন উঠবেন, ঠিক সেই সময় ডাক্তার চ্যাটার্জ্জী বললেন, বসুন, আর একটা কথা আছে।

ভদ্রলোক টাকা-পয়সা মিটিয়ে দিয়ে উঠছিলেন, আবার বসলেন। দেখলাম, তাঁর লাগলো প্রায় ষাট টাকা।

ডাক্তার চ্যাটার্জ্জী বললেন, দেখুন, দাঁতের বিড়ম্বনা থেকে রক্ষা পেলেন, কিন্তু চোখটাকেও অবহেলা করবেন না। দাঁতের গোল থেকে বেশীর ভাগ সময়ই চোখ···

ভদ্রলোক বললেন, আজ্ঞে ঈশ্বরের কৃপায় চোখ আমার ভালোই আছে। কোন রকম···

ডাক্তার চ্যাটার্জ্জী দরাজ হাসি হেসে বললেন, উঁহু, জিনিষটা যত সোজা ভাবছেন, ঠিক ততটা নয়। আপনি কেমন করে জানবেন? আপনার চোখে কি ডিফেক্ট আছে?

ভদ্রলোক চট করে উত্তর দিলেন, কেন, আমি ত বেশ দেখতে পাই।

তা পান, ডাক্তার চাটার্জী বললেন, কিন্তু চোখের ভেতরকার যন্ত্রপাতি সব হয়ত বিগড়ে রয়েছে—আপনি জানতেই পারেন নি। এক দিন দেখবেন কি বিভ্রাট!

ভদ্রলোক একটু ঘাবড়ে গেলেন। মাথা চুলকে বললেন, এমন হয় নাকি? কে জানে মশায়, সময় সময় অবশ্যি চোখ দিয়ে জল পড়ে, চোখ টন টন করে, কেমন যেন···

ডাক্তার চ্যাটার্জী তাঁর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বললেন, ঐ ঐ হয়েছে। আর দেখতে হবে না, ধরেছে। শীগ্রী চোখের ব্যবস্থা করুন, নইলে মহা ফাঁপরে পড়ে যাবেন।

ভদ্রলোক বললেন, কিন্তু আগে ত বললেন না কিছু।

ডাক্তার বিরক্ত হলেন, বললেন, বলে কি হবে? দাঁত জোড়াটা ত সরাতে হবে—চোখের ব্যবস্থা হলে ত আর দাঁত আপসে সারতো না।

ভদ্রলোক কাঁদো কাঁদো মুখ করে বললেন, এই এত গুলো টাকা

খরচ হয়, আবার যদি চোখ সারাতে এক রাশ টাকা লাগে, তাহলে বুঝুনত…

ডাক্তার মিষ্টি করে হেসে বললেন, দেখুন, তার আর উপায় কি? বাঁচা মানেই অর্থ ব্যয়—মড়ার কোন খরচ নেই। কিন্তু বাঁচতেই ত আমরা চাই, আর বাঁচতে হলে নীরোগ হয়েই বাঁচা দরকার। তার জন্যে খরচও হবে।

ভদ্রলোক বললেন, তা ঠিক।

ডাক্তার বললেন তা আপনি যদি দরকার মনে করেন, আমি আপনাকে একজন ভালো অপ্টিশিয়ান দিতে পারি, খুব যোগ্য লোক —আর চার্জ্জও বেশ কম। ডাক্তার সরকার…

ভদ্রলোক ভয়ে ভয়ে ঠিকানাটা নিলেন এবং নমস্কার করে বেরিয়ে গেলেন।

চ্যাটার্জ্জি আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, আসুন, আসুন, আপনাকে খানিক্ষণ বসতে হল। কি করবো বলুন? আমাদের ব্যবসাই এই রকম।

কি বলবো? বুঝলাম, সরকার চাটুজ্যের এবং চাটুজ্যে সরকারের পরম বন্ধু এবং দু'জনেই বেশ বুদ্ধিমান লোক। তাই আমাদের মতো খদ্দেররা টেনিস বলের মতো এঁর হাত থেকে ওঁর হাতে, আবার ওঁর হাত থেকে এঁর হাতে এসে পড়ছে। কিন্তু এসে পড়েছি, দাঁত না তুলিয়ে আর আমার নিস্তার কোথায়?

লোকটি

নিতান্তই চাকরীর দায়। নইলে এই বৃষ্টিতে কি কেউ ঘর থেকে বেরোয়? ওরি মধ্যে যাহক একটু ফাঁক দেখে, হেমন্ত ছাতাটি বগল দাবায় নিয়ে পথে নেমে পড়লো। নলিনী সারা দুপুর বসে বসে কাপড় কুঁচিয়ে দিয়েছে, জামাটা এখনো রয়েছে দিব্যি গিলে-করা, তার ওপর এরি সঙ্গে মানান করে তাকে পরতে হয়েছে পেটেণ্ট লেদারের জুতো জোড়া। তাই ভেজার চেয়ে বড় ভাবনা তার, এই সাজগোজ নষ্ট হয়ে যাবার।

কোন রকমে গলিটা পার হয়ে বড় রাস্তা ধরতে পারলেই আর ভয় নেই—তখন গাড়ী-বারান্দা পাওয়া যাবে অনেক, চাই কি চেনা দোকানও জুটে যেতে পারবে দু'একটা, যেখানে খানিক বসে মাথাটা বাঁচিয়ে নেওয়া যাবে।

হন হন করে চলেছে হেমন্ত। বৃষ্টি তখন ধরেছে-শুধু ঝির ঝির করে পড়ছে দু'চার ফোঁটা থেকে থেকে। যেমন করে বায়না-ধরা ছেলের কান্না থামার পরও অনেকক্ষণ চলে ফোঁপানোর পালা।

গলিটা প্রায় শেষ করে বড় রাস্তায় পড়বে হেমন্ত, হঠাৎ বিরাটকায় এক ভদ্রলোক তার পথ আটক করে দাঁড়ালেন! মাথায় বড় বড় চুল, মুখ ভর্ত্তি গোঁফ-দাড়ি, গায়ে কালো ছিটের গলা আঁটা কোট, পায়ে একজোড়া চটি আছে বটে, কিন্তু প্রকাণ্ড দুটি পা'র বেশীর ভাগই রয়েছে তার বাইরে। এই রুক্ষ রূঢ় ঐরাবতিক আকৃতির লোকটিকে রাত্রে ত বটেই, দিনের বেলা দেখলেও বুক দুর দুর করে ওঠে। অন্তত হেমন্তর মতো কৃশকায় সৌখীন লোকের ত বটেই।

সে পাশ কাটিয়ে ট্রাম-রাস্তায় নামতে চেষ্টা করলো। কিন্তু সেই ঐরাবত এগিয়ে এসে দাঁড়ালো একেবারে তাঁর সামনে। প্রথমটা হেমন্ত অল্প একটু চমকে উঠলো। তারপর এদিক-ওদিক চেয়ে অপেক্ষাকৃত সাহস সঞ্চয় করে পা বাড়ালো।

এবার লোকটি মুখ খুললো এবং সে ভাষাও তার চেহারারই অনুরূপ।

—কি মশায়, বড় যে সরে পড়ছেন? চেনেনই না···কেমন?

অবাক হয়ে তাকালো হেমন্ত। সেই ভয়াবহ মুখে আর প্রকাণ্ড এক জোড়া চোখে আবার অল্প একটু কৌতুকের ছিটে!

লোকটি বললে, দিব্যি দুরন্ত জামা-কাপড় পরেছেন, সোনার বোতাম, চশমা, ঘড়ি, সবই হয়েছে দেখছি—খেয়েদেয়ে আছেন ভালোই, কি বলেন?

হেমন্ত অধিকতর অবাক। কিন্তু একটা কিছু ত তাকে বলতেই হবে—দেরী হয়ে যাচ্ছে, ওদিকে কখন হু-হু করে বৃষ্টি আসবে, তারো ঠিক নেই! কিন্তু মনের আড়াগোড়া মন্থন করেও সে একটা কিছু জুতসই কথা খুঁজে পায় না, যা বলে এই বিদঘুটে লোকটাকে হঠাতে পারে সামনে থেকে।

লোকটিই বললে, নিজে ত বেশ আছেন—কিন্তু গরীব ব্রাহ্মণের ছাপান্নটি টাকার গায়ে ত বেশ জল দিয়ে সরে পড়তে পারলেন!

আর চুপ থাকা চলে না। এবার হেমন্ত বললে, কি বলছেন আপনি? কোন জন্মে আপনাকে দেখেছি বলে ত মনে হয় না!

এবার লোকটির স্বর যেন একটু চড়লো। ভয়ঙ্কর সেই চোখ দুটিতে কিন্তু সেই চাপা কৌতুকের ঝিলিক! সে বললো, তা দেখবেন কেন? আজ যে মনে না রাখাতেই সুবিধে। আপনি আর আপনার মতো গুটি কয়েক ভদ্রসন্তানের পাকে পড়েই ত আজ এমন পথে বসেছি।

এবার চটলো হেমন্ত। সে বললে, দেখুন মশায়, আপনি কে তা জানি না—কস্মিনকালেও জানতাম না। আপনি হয় আমাকে অন্য কেউ বলে ভুল করছেন, নয়…

লোকটি হো হো করে হেসে উঠলো। কিন্তু পথটা সমান গাম্ভীর্য্যেই আটকে রইলো, আর হাসিটা তার যত উচ্চই হক, বোঝা গেল, তার তলায় দৃঢ় একটি সঙ্কল্পের চেহারা আছে।

হঠাৎ অত্যন্ত নীচু পর্দ্দায় গলা নামিয়ে এনে সে বললে, ভুল যে করিনি, তার প্রমাণ চাই? তবে শুনুন, মশায়ের নাম হেমন্ত কুমার চৌধুরী—পনেরো বছর আগে মশায় থাকতেন মদন মিত্রের গলিতে—বোধ হয় ২৯ নম্বর বাড়ীতে। মশায়ের বাবার নাম হরেন্দ্রনাথ চৌধুরী—তিনি আলিপুরে ওকালতী করতেন মনে হচ্ছে। মশায়ের মা মারা গিয়েছিলেন, হঠাৎ ষ্টোভ ফেটে কাপড়ে আগুন ধরে গিয়ে, কি না?

চমকে উঠলো হেমন্ত। লোকটা ত আগাগোড়াই নির্ভুল বলে যাচ্ছে। একেবারে খুঁটিনাটি পর্য্যন্ত!

লোকটি বললে, মশায় ত আমাকে চেনেন না, আপনাকে আমি চিনি কেন?

বলেই মিষ্টি করে হেসে বললে, আরো বলছি—মশায়ের ডাক নাম হল ডাবু। ন'বছর বয়সে মামার বাড়ীতে মাথায় একটা ডাব পড়েছিল—তখন থেকেই ঐ নামের স্বরু, কেমন?

হেমন্ত অধিকতর বিস্মিত।

লোকটি বললো, মশাই যখন ফাষ্ট ইয়ারে পড়েন, তখন বাবা মারা যান-সংসারে তখন বেজায় কষ্ট—হরিপদ পাত্র বলে এক ভদ্রলোক তখন মাসে মাসে পনেরো টাকা করে মশায়দের সাহায্য করতেন।

হেমন্ত আর স্থির থাকতে পারলো না। এবার তাকে নীরবতা ভঙ্গ করতেই হল।

সে বললো, আপনি কে মশায় ? হয় একজন গোয়েন্দা হবেন, নয়ত কোন আত্মীয় আমার—ছদ্মবেশে ঘোরাফেরা করছেন, হঠাৎ পথে পেয়ে রসিকতা জুড়ে দিয়েছেন।

লোকটি নরম গলায় জবাব দিলে, ব্যস্ত হবেন না মশায়। আমি গোয়েন্দা নই, আপনার কোন আত্মীয়ও নই—আমি নেহাৎই তিনকড়ি চাটুজ্যে।

— তিনকড়ি চাটুজ্যে ? কৈ কখনো ত এই নামের কোন ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ ছিল, মনে পড়ছে না।

—পড়ছে না ? ভালো করে ভাবুন ত। সেই গোপাল সরকারের গলিতে যখন থাকেন, তখন এই গরীবের দোকান থেকে চাল, ডাল, তেল, কয়লা দু'বেলা নিয়ে যেতেন—একটি পয়সা দিতেন না। ভদ্রলোক, পড়েছেন অভাবে—বিশ্বাস করে দিয়েছি, জানতাম, একদিন শোধ করবেনই। তারপর হঠাৎ কখন বেপাত্তা সরে পড়লেন—ব্যাস, আজো গেলেন, কালও গেলেন ! একেবারে তেরো বছর পরে আজ দেখা।

হেমন্ত আমতা আমতা করে বললো, আপনি গোড়ায় যা-কিছু বললেন, সবই সত্যি। কিন্তু শেষটা ত একদম মিললো না। গোপাল সরকারের গলিতে যে মুদীর দোকানে আমরা সওদা করতাম, তার নাম ছিল কালী দত্ত—আর তার কাছে কৈ ধারে ত নিতাম না আমরা।

তিনকড়ি চাটুজ্যে বললে, সত্যি বলছেন ? আচ্ছা ধরুন যদি বলি, মুকুন্দ রায়ের গলিতে আমার বাড়ীতে ভাড়াটে ছিলেন—পাঁচ মাসের ভাড়া ষাট টাকার মধ্যে মাত্র চারটে টাকা দিয়েই একরাত্রে তল্পিতল্পা বেঁধে চম্পট দিলেন।

—মোটেই না। মুকুন্দ রায়ের গলিতে আমরা থাকতাম দুর্গাপ্রসাদ ঘোষের বাড়ীতে, তাঁকে শেষ আধলাটি পর্য্যন্ত মিটিয়ে দিয়ে তবেই উঠে গেছি !

—ও তাই নাকি! আচ্ছা তাহলে...

ইতিমধ্যে হু-হু করে এলো বৃষ্টি। হেমন্ত বললে, ছাড়ুন মশায়, পথ ছাড়ুন। আমার অফিস আছে, ওদিকে জল আসছে।

লোকটি হেসে বললো, আহা যাবেনই ত। আপনার অফিস আছে, স্ত্রী-পুত্র আছে, ভালো জামা-জোড়া আছে, আমার কিছু নেই! কিন্তু টাকাটার আমার কি ব্যবস্থা হবে?

—আমি কিন্তু সত্যিই আপনাকে চিনিনি। মনে হচ্ছে আপনি...

এদিকে সরে না গেলে ভিজে পুড়ে একাকার হতে হবে। ওদিকে লোকটিও নাছোড়বান্দা। সে বললে, আসুন ঐ ছাতের তলায় দাঁড়াই। আপনি ত একবার সরে পড়তে পারলেই আবার ডুব দেবেন। দৈবাৎ আজ যখন পেয়ে গেছি, তখন পুরানো দেনাটার একটা ফয়সলা হয়ে যাক।

দু'জনে দৌড়তে দৌড়তে এসে দাঁড়ালো সামনের গাড়ীবারান্দার তলায়। সেখানটা তখন ভরে গেছে রকম-বেরকমের হাজারো লোকে। ওরি মধ্যে ঠেলাঠেলি করে দু'জনে এসে দাঁড়ালো এক কোণায়।

তিনকড়ি হঠাৎ অমায়িক আত্মীয়তায় হেমন্তর গলা জড়িয়ে ধরে বলে উঠলো, হেমন্তদা মাই ডিয়ার, কেমন আছো ভাই? টাকাটা কি নেহাতই দেবে না ঠিক করেছো?

হেমন্ত আরো বেশী অবাক হয়ে গেল। সে বুঝলো, নিশ্চয় কোন পাগলের পাল্লায় পড়েছে। এর হাত থেকে মুক্তি পাবার উপায় কি, কি করে এর আক্রমণ এড়িয়ে পালানো যায়, ভাবতে লাগলো সে। একবার মনে হল, আচ্ছা, সত্যিই কি তিনকড়ি বলে কোন লোকের টাকা ধারতো সে, সত্যিই কি?

তিনকড়ি আরো ভালো করে জড়িয়ে ধরলো তাকে। তারপর বললে, কি, বড়ই অস্বস্তি হচ্ছে, না? শালা, তুমি আজ সাহিত্যিক হয়েছো—আর একটি গরীবের টাকা মেরে...

এবার হেমন্ত চটলো। গলা চড়িয়ে সে বললো, খবদ্দার! ছোটলোকী করো না—পাগল কোথাকার!

তিনকড়ির আবার সেই হাসি। হাসির পালা শেষ করে সে বললো মাইরি চিনতে পারিস নি, মাইরি করে বল দেখি মাইরি!

হেমন্ত আর স্থির থাকতে পারে না। লোকজন ডাকতেই হয় তাকে —নইলে কতক্ষণ আর সে একটা পাগলের হাতে নাকাল হবে?

হঠাৎ অতর্কিতে তিনকড়ি তার গালে প্রচণ্ড এক চড় বসিয়ে দিয়ে বললে, রাস্কেল! একসঙ্গে নারায়ণ ভটচায্যির গোয়াল থেকে বঙ্গবাসী পর্য্যন্ত পড়ে গেলাম—একসঙ্গে সিগারেট খেতে শিখলাম, কবিতা লেখা ধরলাম—আজ আমায় চিনতে পারো না?

হেমন্ত ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইলো। ব্যাপার কি? লোকটা কে—কি চায় এ?

তিনকড়ি বলে উঠলো, আমি চন্দর।

—অ্যাঁ—এই দশা কেন তোর? এ চেহারা…

—আশ্রম খুলেছি, আচার্য্যির আবার কি রকম চেহারা হবে?

—তা—

—বলবো, বলবো, সব বলবো রে। এখন চল কোথায় যাবি।

হেমন্ত এতক্ষণে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো। বৃষ্টিটাও ধরে এসেছে—ছাতা খুলে সে বললো, চ শুনতে শুনতে যাই।

কুমার-শীকার

বৈকালিক স্নান ও চা-পান শেষ করেছি। সহবাসী বিনোদবাবু অফিস থেকে ফিরলেই বেরুবো। আশ্চর্য্য আমাদের একত্র থাকা! তিনি দশটায় বেরোন, ফেরেন পাঁচটায়—আর আমি বেরুই পাঁচটায়, ফিরতে হয়ে যায় রাত্রি এগারোটা, কোন কোন দিন বারোটাও। শুধু রবিবার দুপুরে কিছুক্ষণের জন্যে দু'জনে দেখাশুনা ও কথাবার্ত্তা হয়, কদাচিৎ এক আধ বাজী তাস-দাবাও চলে। নইলে পালা করে পরস্পরের ধন-সম্পত্তি পাহারা দেওয়া এবং রাত্রে এক ঘরে ঘুমানোতেই আমাদের সহবাসিত্বের কর্ত্তব্য সীমাবদ্ধ থাকে।

সকালবেলা অবশ্য দু'জনেরই অবকাশ, কিন্তু তিনি সে সময় করেন টিউশানি, আর আমার আছেন স্যার রীতেন—যাঁর রাজনৈতিক ক্রিয়া-কলাপ এখন ঠেকেছে কাগজে বিবৃতি ছাপানোতে এসে এবং সেই জন্যে (সংবাদপত্রের কার্য্য-নির্ব্বাহক সম্পাদক) আমার দৈনিক উপস্থিতি যাঁর চাইই।

বলা নিষ্প্রয়োজন যে স্যার রীতেন আমার হিতাকাঙ্ক্ষী। যদিও কাগজের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে আমার হাত দিয়ে পলিসি বহাল রাখার জন্যই তাঁর আমাকে দরকার, তবু প্রত্যহিক আনাগোনা ও আদান-প্রদানের ফলে আমাদের মধ্যে বিষয়-নিরপেক্ষ ভাবে একটা সামাজিক সম্বন্ধই গড়ে উঠেছে। এটা আমার দিক থেকে নিশ্চিত লাভের কারণ—আজ যে আমি কলকাতার বিশিষ্ট সমাজে সগৌরবে চলাফেরা করি এবং আমার চেয়ে বেশী বা আমার সমান লেখাপড়া জেনেও যারা আমার ঢের পেছনে পড়ে রয়েছে, আর জীবন-সংগ্রামে বিব্রত হয়ে প্রতিনিয়ত ধুঁকছে, তাদের সম্বন্ধে অকুণ্ঠিত অনুকম্পার ভাব পোষণ

করি, এ ত স্থার রীতেনরই সাহচর্য্যের ফল! হয়ত কোন দিন এই সিঁড়ি বেয়েই সেই উচ্চভূমিতে গিয়ে দাঁড়াবো, যেখান থেকে পৃথিবীটাকেই দেখাবে নেহাৎ একটা ফুটবলের মতো, এক পদাঘাতেই যা কেন্দ্রচ্যুত হয়ে গড়াতে গড়াতে মহাসমুদ্রে অবলুপ্ত হয়ে যাবে।

যাই হক কি বলছিলাম? হ্যাঁ, বেরুবার জন্যে তৈরি হচ্ছি। তার আগে মাতা ঠাকুরাণীকে চিঠি একখানা দিতে হবে। ক'দিন হল, দুঃখ করে তিনি লিখেছেন, "তুমি বাড়ীতে চিঠি দাও না—লেখাপড়া শিখিয়াছ, মানুষ হইয়াছ, কিন্তু বিবাহ করিলে না। সামান্য একশ' দেড়শ' টাকার জন্য কলিকাতার মেসে একা পড়িয়া রহিলে। নিজের বিষয়-সম্পত্তি ও কাজ-কারবার বৃদ্ধ পিতার ঘাড়ে রহিল। তাহা দেখাশুনা করিলে রাজার হালে থাকিতে এবং মাসে কয়েক শত টাকা অনায়াসেই আনিতে পারিতে। জ্যেষ্ঠ পুত্র হইয়া তুমি এমন অবিবেচক হইতেছ, ইহা আমাদের যে কত বড় দুর্ভাগ্য, তাহা আর কি লিখিব?" এম্নি আরো অনেক কথা! যদিও মা-ই লিখেছেন এ চিঠি, তবু এর পেছনে বাবার হাতের ছাপ স্পষ্ট—তাই জবাবটা একটু গুছিয়ে দিতে হবে।

আশ্চর্য্য এই সেকেলে আদর্শ! কাজ-কারবার ও বিষয়-আশয়ের নিরাপদ আশ্রয়ে থেকে, স্ত্রী ও পুত্র-কন্যার সম্মিলিত কোলাহলের ভেতর দিন না কাটলেই, এঁরা মনে করেন জীবন ব্যর্থ হল। এই যে আমি সাংবাদিকতা করছি—দেশের শিক্ষা-সংস্কৃতি ও জীবন-নীতির মূলধারাগুলিকে আপন ইচ্ছামতো ঘোরাচ্ছি ফেরাচ্ছি, আর তারি প্রসাদে ধাপে ধাপে আভিজাত্যের উচ্চতম মার্গে উঠবার পথ প্রশস্ত করছি, এর মূল্য যদি তাঁদের বোঝাতে পারতাম! আর বিবাহ? মনে মনে জীবন-যাপনের আমার যে একটি আদর্শ আছে, তার জন্যে যে রকম সঙ্গী ও সংস্থান দরকার, তা এখনো পাইনি বলেই যে আমাকে একা থাকতে হয়েছে, এটাও যদি তাঁদের স্বীকার করানো আমার দ্বারা সম্ভব হত!

লেটার-পেপার নিয়ে বসেছি। এক লাইন কেঁদেছি, এমন সময় বারান্দা থেকে মিহি গলায়, ভেতরে আসতে পারি ?

তাকিয়ে দেখি একটি তরুণী। অবাক। কলকাতার মেসে, যেখানে অবিবাহিত ছাত্র, বিবাহিত কেরাণী এবং বিপত্নীক দালাল আমরা প্রত্যহ গাদাগাদি করে থাকি, আর তর্ক-বিতর্ক ঝগড়া-ঝাঁটি, আলাপ-কলহের জঞ্জাল ঠেলে হৈ-হৈ করে দিন কাটাই, তার ভেতর তরুণী ? আর এমন সলজ্জ সুবেশা সুন্দরী আধুনিকা !

আস্তে ব্যস্তে বললাম, আসুন, আসুন। তিনি এলেন এবং অবলীলায় ঘরের একমাত্র চেয়ারটি দখল করে বসলেন। আমি বিমুগ্ধ শ্রদ্ধায় তাঁর আদেশের মুখ চেয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম নিঃশব্দে।

তিনি বলিলেন, দেখুন, আমি হচ্ছি একজন সেলসউম্যান...'ফ্যাসন হাউস' জুয়েলার্সদের ক্যানভাসিং ওয়ার্ক করি।

আমি বললাম, কিন্তু এটা ত মেস। এখানে কি কেউ গয়না কেনার লোক আছেন ? গয়না কি ব্যাটাছেলেতে কেনে ?

তিনি হেসে বললেন, কেনে মেয়েরাই, কিন্তু কেনার উপায় ত আপনারা !

—সে বাধ্য হয়ে।

—সে রকম বাধ্য-বাধকতা ত আপনাদের নেই এমন নয় !

সবিনয়ে বললাম, আজ্ঞে, আপনি ভুল করেছেন, আমার ওদিক থেকে কোন বালাই নেই। আমি নিতান্তই সিংগল।

তিনি হাসলেন। তারপর বললেন, কিন্তু কোন মানসীও কি নেই, যাঁর জন্যে একটা ব্রোচ, কি এক জোড়া ঝুমকো, কি এক পেয়ার আম্লেট নিতে পারেন ?

সলজ্জ ভদ্রতায় জানালাম যে সে রকম কোন বালাইও আমার আপাতত নেই। আমি একজন জার্ণালিষ্ট এবং শুকনো পলেটিক্সের

পাথর ভেঙেই আমার দিন কাটে—ওর বাইরে আর নজর চলে না।

তিনি বিষন্ন মুখে বললেন, আপনার বাইরের পরিচয় জানি বৈকি। ভেতরের খবরটা জানা ছিল না বলেই, ধরে নিয়েছিলাম যে এই পাথরের তলায় কোথায় ফল্গুধারা থাকতে পারে।

অবাক! বললাম, আমার পরিচয় পেলেন কি করে?

—স্যার রীতেনরা আমার কাষ্টমার কিনা। তাদের বাড়ীতে আপনার কথা প্রায়ই শুনি ..সেখান থেকেই সব খবর সংগ্রহ করেছি।

বুঝলাম। বললাম, কিন্তু যতটা শুনেছেন, তার বাইরে আর আমার কোন পরিচয়ই নেই। সুতরাং কি করি বড়ই দুঃখের বিষয়…

তরুণী হাতের ফোলিও ব্যাগটি মাটিতে নামিয়ে রেখে দু'হাতে দুটি হাঁটু কায়দা করে ধরলেন, তারপর কৌতুক মিশ্রিত কণ্ঠে বললেন, কিছু মনে করবেন না, আপনি সিংগল থাকছেন কেন?

মহাবিপদ! বললাম, দেখুন বিয়ে করাটা আমার মতে একটা বিলাসিতা। ওটা যে রকম শক্তি থাকলে করা শোভা পায়, তা আমার নেই। তাইতেই…

তিনি হাসলেন। বললেন, কিন্তু আপনার অবস্থা যা শুনেছি, তাতে জানি আপনি বেশ ধনীই, চাকরিও করেন ভালো।…তার ওপর লেখেন চমৎকার, আপনার লেখাও পড়েছি কাগজে। আমাদের বেথুন কলেজে ত আপনার লেখা নিয়ে মেয়েদের মধ্যে হৈ-হৈ হয়—প্রত্যেক মেয়ে শনিবারের 'দেশ-সেবক' কেনে, আর ভীষণ তর্ক চালায়। কেউ বলে আপনি বিবাহিত, কেউ বলে না—আর তা নিয়ে কত বাজী ফেলাফেলিই হয়। একটু থেমে বললেন, আপনার মতো লোকও যদি ব্যাচিলার থাকেন, তাহলে দেশের ভবিষ্যৎটা কি বলুন ত?

এবার আর কিছু না বললে ভালো দেখায় না। বললাম, ত্রুটি

নেবেন না, আপনিও রীতিমতো শিক্ষিতা এবং কথাবার্ত্তা থেকেই বুঝছি, সাধারণ স্তরের ঢের ওপরে। আপনিও ত সিংগলই রয়েছেন!

বিদ্রূপের সুরে তিনি বললেন, উপায় কি? আপনারা মেয়েদের সঙ্গে প্রেম করতে পেলে আর কিছু চান না, কিন্তু বিয়ের ব্যাপারে সবাই জানেন এক-একটি পিতৃভক্ত পরশুরাম। তখন গয়না আর টাকার ফর্দ্দ বের হয়। তা জোটেনি বলেই হয়নি...ফোর্থ-ইয়ারে পড়ি, আর তারি ফাঁকে ফাঁকে বড়লোকের মেয়েদের কাছে গয়না বেচে কমিশন পাই। পুরুষ খদ্দের আপনিই প্রথম এবং প্রথম কেসেই ফেলিওর।

বললাম, কি করবো বলুন? আপনার এমন জিনিষ নিয়ে কারবার, যা ব্যাচিলার পুরুষের কাজে লাগে না...নইলে...। তারপর একটু সৌজন্য দেখিয়ে বললাম, আচ্ছা, আপনার ঠিকানাটা দিয়ে যান, আত্মীয়-বন্ধু বা চেনাশোনার মধ্যে কারুর দরকার হলে আপনাকে জানাবো।

তিনি মিষ্টি হেসে বললেন, সুলতা ব্যানার্জ্জী, অমর লজ—১৬ মাণিক-তলা রো।

কলম হাতেই ছিল। লেটার পেপারে টুকে নিলাম। তারপর বললাম, আচ্ছা...যতটা পারি আপনাকে সাহায্য করতে চেষ্টা করবো।

তিনি বললেন, ধন্যবাদ। আচ্ছা চললাম। আপনার সময় নষ্ট করলাম খানিকটা, মাপ করবেন। আর হ্যা, স্যার রাতেনের বাড়ী বলবেন না দয়া করে যে আপনার কাছে আমি গয়না বেচতে এসেছিলাম। তাহলে তারা আমার সম্বন্ধে হয়ত কি ভাববেন! বড্ড অভাব, তাই ঠিকানা পেলেই...বুঝতেই ত পারছেন। নমস্কার করে তিনি বেরিয়ে গেলেন।

* * * *

হাতের কলম হাতেই রইলো। কেমন একটা স্তম্ভিত সম্মোহে স্থির হয়ে বসে রইলাম অনেকক্ষণ। কি চমৎকার মেয়েটি...যেমন চেহারার দীপ্তি, তেমনি বুদ্ধির ঔজ্জ্বল্য, তেমনি কথার ধার। আর জীবন-সংগ্রামকে

হাসি মুখে নেবার কি বলিষ্ঠ সংসাহস! যৌন-সঙ্কোচ-মুক্তা এমন সপ্রতিভ মেয়ে কদাচিৎ দেখেছি। বাস্তবিকই একটি সত্যিকার প্রথমশ্রেণীর মেয়ে! মনে হতে লাগলো, বিনা প্রয়োজনেও কিছু গয়না নিয়ে ওকে সম্মানিত করা উচিত ছিল···রিক্ত হাতে ওকে ফিরিয়ে দিয়ে যেন নিজের বুকটাই খালি মনে হতে লাগলো।

মাকে চিঠি লেখা হল না। মনটা হারিয়ে গেল কোথায়! আনমনে লিখতে লাগলাম—সুলতা ব্যানার্জ্জী, মিস সুলতা···অমর লজ···১৬ মাণিকতলা রো··ব্রোচ,আর্মলেট, ঝুমকো···ফ্যাসান হাউস,জুয়েলার্স··!

ইতিমধ্যে বগলে ছাতা, হাতে গ্ল্যাডষ্টোন ব্যাগ, চোখে রূপোর চশমা কাঁচা-পাকা বয়সের একটি ভদ্রলোক দরজা দিয়ে একবার উঁকি দিলেন। কোন ইন্সিওরের দালাল নিশ্চয়। অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে লেখাব আয়োজন নিয়ে ব্যস্ত হবার চেষ্টা করলাম, কিন্তু অপরিহার্য্য ভদ্রলোক!

—দেখুন স্যার, আমি ইন্সিওরেন্সম্যান নই, জেণ্টলম্যান!

—কিছু বলছেন আমাকে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, কিন্তু ভেতরে ঢুকে বলাই বোধ হয় সুবিধা—নয় কি?

—আসুন, আসুন।

ভদ্রলোক এলেন এবং সুলতার পরিত্যক্ত চেয়ারটিতে জাঁকিয়ে বসলেন। কোথায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাব্য থেকে উঠে-আসা মূর্ত্তিমতী সৌন্দর্য্যলক্ষ্মী সুলতা, আর কোথায় আধুনিক উপন্যাসের নায়ক এই গোঁয়ার-গোবিন্দ মার্কা জেণ্টলম্যান!

বললাম, বলুন। তিনি বললেন, দেখুন স্যার, আমার শিশির বাবুকে একটু দরকার। কিন্তু ভদ্রলোকের পাত্তা পাই না—সকালে আসি, দুপুরে আসি, বিকেলে আসি, সারাদিনই দেখি ঘরে তালা দেওয়া। এখনো দেখছি নেমপ্লেটে 'আউট' লেখা। ডবল্ সিটেড্ রুম আপনাদের—বুঝছি, আপনি তাঁর রুম-মেট।

—আজ্ঞে হঁ্যা, তিনি পলিটিক্স করেন—দিন রাত্রি বাইরেই কাজ। তা কি দরকার, যদি বাধা না থাকে, আমায় বলে যেতে পারেন। তাঁকে বলবো খ'ন।

—দেখুন, একটি বিয়ের নেগোসিয়েশন নিয়ে ঘোরাফেরা করছি। শুনেছি ছেলেটি শিক্ষিত, বুদ্ধিমান, রোজগারও করেন ভালো—বাড়ীর অবস্থাও নাকি বেশ স্বচ্ছল, জমি-জায়গা, কাজকারবার আছে।

—শুনেছি।

—তা কেন বিয়ে করেছেন না বলুন ত?

—খুব একটা বড় দাও খুঁজছেন বোধহয়।

—তা আমরাও নেহাৎ মন্দ দেব থোব না। মেয়েও বেশ ভালো, বি-এ পড়ে, গান-বাজনা, সেলাই-ফোঁড়াই, কবিতা লেখা, সব বিষয়েই এক্সপার্ট। চেহারা যদি দেখেন স্যার···কি বলবো, জুলিয়েটও বলতে পারেন, রোজেলিণ্ডও বলতে পারেন! আব যদি আধুনিক চান, তাও বলতে পারি, খাসা লিকলিকে ললন্তিকা মেয়ে···একেবারে 'ত্রিলোকের হৃদি-রক্তে আঁকা তব চরণ শোণিমা।'

কৌতুক বোধ করলাম। বললাম, আপনার কে মেয়েটি?

—আমার? আর বলবেন না স্যার, শালী···উঃ হাতছাড়া করতে বুক ফাটে, অথচ আমাকেই করা হয়েছে ইনষ্ট্রুমেণ্ট, অর্থাৎ কিনা সুইসাইডের অস্ত্র হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।

—তা দেখুন, আপনি বৃথাই কষ্ট করছেন, ওঁর দ্বারা বিয়ে করা হয়ে উঠবে কিনা সন্দেহ!

—কেন? কি এমন কঠিন কাজ এটা?

—কঠিন নয় বলেই ত এখনকার লোকের ওতে আস্থা নেই।

—তা ভদ্রলোক কি কোন রকম লটরপটরের ব্যাপারে···

—বলতে পারি না, তবে যে রকম সাজগোজ দেখি, টাকা-পয়সার

যে রকম ছড়াছড়ি গড়াগড়ি দেখি···গান, কবিতা, ছবি নিয়ে যে রকম মাতামাতি দেখি, তাতে একটা কিছু··

—অবিশ্যি তাতে যায় আসে না স্যার। আইবুড়ো পুরুষের এক্সপিয়েরিয়ান্স একটু ভ্যেরীড হওয়াই ভালো—তাছাড়া টুনু এমন জাঁহাবাজ মেয়ে, একবার কায়দায় পেলে স্যার, আপনার বন্ধুটিকে একেবারে 'দি র‍্যাম মানে ঐ ভেড়া' করে তবে ছেড়ে দেবে।

—ওঃ বাবা!

—আজ্ঞে হ্যাঁ। এই ত চাই···নইলে ফ্যাচ ফ্যাঁচ করে কাঁদবে, আর গ্যাব গ্যাব করে তেলে-ভাজা খাবে, সে কি আবার ওয়াইফ?

হাসলাম। বললাম, আচ্ছা, তা আপনাদের বাঁড়টা কতদূর একটু জেনে রাখি—মেয়েটির ডিটেলসও একটু দিয়ে যান, বলবো তাঁকে।

ভদ্রলোক কষ্ট করে ব্যাগ খুললেন—বেরুলো একখানি খাতা, তাতে তালিকা রয়েছে গহনার ও দানসামগ্রীর। গড়গড় করে পড়তে সুরু করলেন, পাত্রের ঘড়ী, আংটি, চশমা ·····

বাধা দিয়ে বললাম, আহা ও তাঁকেই বলবেন। আমি শুধু একটু আঁচ নিতে চাই আর কি······অবিশ্যি তাতে ফল কিছু হবে কিনা সন্দেহ। একটু চেষ্টা করতে পারি···এই পর্য্যন্ত।

ভদ্রলোক থামলেন। তারপর বললেন, আচ্ছা, থ্যাঙ্ক ইউ ভেরী মাচ। যদি হিল্লে হয় দেখবেন, আপনার সম্বন্ধে আমি বিবেচনা করতে ভুলবো না।

বললাম, ধন্যবাদ।

ভদ্রলোক ছাতা এবং ব্যাগ নিয়ে উঠে দাড়ালেন। তারপর শিষ্ট হাসি হেসে বললেন, তা আপনার নামটি কি স্যার?

—বিনোদবিহারী ঘোষ।

—আপনারা গয়লা নন নিশ্চয়।

—আজ্ঞে না—কায়স্থ।

—বিয়ে-থাওয়া?

—হয়েছে—তিনটি ছেলে-মেয়ে।

—বেশ, বেশ। দেশকে নারায়ণী সেনা দিন, জাতীয় যুদ্ধে লড়বে কে? বেলুড়ের বৃহন্নলা নয়ত সোসাইটীর সাইনোসিয়ার হয়ে কি এমন পরমার্থ লাভ করবেন আর?

—বটেই ত।

ভদ্রলোক বেরিয়ে গেলেন। স্থলতার আবির্ভাবে ঘরের ভেতর যে একটি মোহনীয় স্বপ্নের হাওয়া বইছিল, তাকে নষ্ট করে দিয়ে তবে এই ফিলিষ্টাইনের অন্তর্ধান হল। মনে মনে হাসলাম। কন্যাদায়ের আক্রমণ এই প্রথম নয়, তবে বিনোদবাবুর দকলমায় আত্মরক্ষা করার সুবুদ্ধি এর আগে হয় নি।

* * * *

মাতা ঠাকুরাণীকে চিঠি দেবার দিন দশেক পরেই মূর্তিমান উত্তর রূপে এসে হাজির হলেন পিতাঠাকুর মহাশয়।

কথা নেই, বার্তা নেই, ঘরে ঢুকেই তিনি বললেন, গাড়ী ডাকাও, জিনিষপত্র ওঠাও, শ্যামবাজারে বাসা ভাড়া করেছি—বাড়ীর সবাই সেখানে এসেছে।

—হঠাৎ?

—হ্যাঁ। তোমার বিয়ের দিন ঠিক করেছি—৮ই, শুক্রবার।

—বিয়ে?

হ্যাঁ বিয়ে। আকাশ থেকে পড়লে নাকি? মেসে থেকে চাকরি করছো, আর দুনিয়ার ছুঁড়ীদের গয়না জোগাচ্ছো, ··এ রকম দেশোদ্ধার আমার চাইনে।

—সে আবার কি?

—কি তা ভালো করেই জানো, কিন্তু থাক ও সব। কাল সকালে তোমার আশীর্ব্বাদ। এখুনি ওঠো, অফিসে গিয়ে ছুটি নিয়ে সোজা বাড়ী চলে এসো। অবাধ্য যদি হও, তাহলে বাড়ী-ঘর বিষয়-আশয় সমস্ত বিক্রি করে কালই আমি কাশী চলে যাবো—আর যাবার আগে স্যার রীতেনকে বলে তোমার চাকরিটি খুইয়ে যাবো, ভদ্রসমাজে তোমার মুখ দেখানো পর্য্যন্ত বন্ধ করে দোব। চালাকি ? আমি বেঁচে থাকতে, আমার অনুমতি না নিয়ে তুমি সুলতা ব্যানর্জ্জীর সঙ্গে ঢলাঢলি করবে!

—সুলতা ব্যানার্জ্জী ?

—হ্যাঁ গো, যার জন্যে তোমার ভাবনার অন্ত নেই—ব্রোচ কিনছো, আর্মলেট কিনছো, ঝুমকো কিনছো! কত টাকার বিল হল ফ্যাসন হাউসে ? অ্যাঁ····এই তোমার বিবাহে অনাসক্তি ? এ রকম নিও-রোম্যান্টিক ব্রহ্মচর্য্য আমার পেটে সহ্য হবে না বাবা!

সর্ব্বনাশ! মাকে চিঠি দেবার সময় লেটার-পেপারে কি সব লিখেছিলাম সুলতা সম্বন্ধে। সোজা পিঠে চিঠি লিখেছি, উল্টো পিঠে কি রয়ে গেল, তা আর ফিরেও দেখিনি। ছি ছি কি মনে করেছেন ওঁরা কে জানে! আর এম্নি বিপদ যে এর সংশোধনেরও পথ নেই!

নিঃশব্দে পিতৃ-আজ্ঞা পালনে অগ্রসর হতে হল। পিতৃদেব শান্ত হলেন এবং অপেক্ষাকৃত মোলায়েম কণ্ঠে বললেন, তা ভয় নেই বাবা। তোমাকে যে মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দিচ্ছি সে বি-এ পড়ে, দেখতেও খাসা, ওঁরা ঘরও খুব বড়। হাত-পা বেঁধে একটা বন্য জন্তুর বোঝা তোমার ঘাড়ে তুলে দিচ্ছি না—তোমার ওপর তোমার যতটা মায়া, আমারও তার কিছুটা আছে ত!

তবু সলজ্জকণ্ঠে বললাম, একবার···

—দেখা ? ওটি হবে না। তোমার ঠাকুদ্দামশায়ের কাছে ঐ কথা বলে আমি একপাড়া লোকের সাম্নে খড়ম খেয়েছিলাম। সেই বাপেরই

ব্যাটা আমি···বুঝেছো! যা ধরে দোব, ভদ্রলোকের মতো ভালো মুখ করে তাই নেবে, নইলে বুঝেছো কি না···শুধু এইটুকু জেনে রাখো যে স্বয়ং স্যার রীতেন এই সম্বন্ধের ভেতর আছেন। তাঁরই সার্টিফায়েড পার্টি···এর বেশী কিছু টঁ্যা-ফোঁ করো ত কপালে কষ্ট আছে জানবে।

দু' মিনিট পরে আবার পিতৃদেব কথা কইলেন। বললেন, তোমার মাতা ঠাকুরাণীকে যদি আমি বিয়ে করে থাকতে পেরে থাকি, আর তাতে যদি আমার কোন ক্ষতি না হয়ে থাকে ত আমি তোমার যে বিয়ে দিচ্ছি, তাতে তোমারও কিচ্ছু ক্ষতি হবে না। ও সব কাব্যি ছাড়ো বাপু . জীবনটা কাব্যি নয়!

বুঝলাম নিরুপায়। মেস ছেড়ে চললাম। হায় সুলতা, হায় উড়ো পাখী, দু' মিনিটের জন্যে কেন তুমি ডানা গুটিয়ে বসেছিলে আমার ঘরে, চিরদিনের জন্য আমাকে কাঁদিয়ে যাবার জন্যে?

একবার মনে হল, বিদ্রোহ করি। পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, বর্ত্তমান-ভবিষ্যৎ···সব কিছুর মায়া কাটিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ি দুর্গমে। সঙ্গে নিই সুলতাকে—বাঁধা ব্যবস্থার সুনিয়ন্ত্রিত শৃঙ্খল ভেঙে কঠিনের ভেতর দিয়ে আস্বাদ করি জীবনকে। কিন্তু বৃথাই সে উত্তেজনা!

*   *   *   *

ঘাড় গুঁজে নিঃশব্দে মন্ত্রপাঠের পর্ব্ব শেষ করলাম। স্ত্রী-আচারের পালা চলেছে, সে-ও ঘাড় গুঁজে। পাত্রীও যথাসম্ভব ঘাড় গুঁজেই আছেন —বোধ করি তাঁর দিক থেকেও চলছে বিষবড়ি গলাধঃকরণের পালা! শুভদৃষ্টির সময় দু'জনের মাথার উপর যেই পড়েছে সিল্কের একখানি চাদর, আর একটি ছোট মেয়ে তুলে ধরেছে ঘিয়ের একটি প্রদীপ, অমি পেছন থেকে দুটি হাত এসে ধরলো দুটি কান—আর পাত্রীও জিভ বার করে চোখ মটকিয়ে ফিক করে হেসে উঠলো। আরে?

সুলতা... ? কিন্তু এর নাম ত ঝর্ণা···মাণিকতলা ত নয়, এদের বাড়ী যে চোরবাগানে। আর এরা ত বলাগড়ের রাজবংশ। কি আশ্চর্য্য! এতক্ষণে ব্যাপারটা আস্তে আস্তে মাথায় ঢুকলো।

চাদর উঠতেই দেখি, সহাস্যবদন আমাদের সেই জেণ্টলম্যান। তিনি আমার গলা জড়িয়ে ধরে বললেন, কি দাদার বিনোদ ঘোষ, চিনতো পারো ?

—পারি বৈকি জেণ্টলম্যান বাবু, কিন্তু আপনার ব্যাগটি কোথায় ? খাতাখানা কৈ ?

—সব রেখেছি, তৃতীয়াটির হিল্লেয় বেরুবার সময় আবার লাগবে।

বাসর ঘরে ঝর্ণাকে বললাম, এবার আমি প্রচুর গয়না কিনবো' বুঝেছেন !

অন্যেরা হো হো করে হাসতে লাগলো।

ঝর্ণা বললো, আচ্ছা প্যাটার্ণ পাঠাবো'খন।

সহৃদয় সহযাত্রী

ভদ্রলোকটি অমায়িক আত্মীয়তায় বিগলিত হয়ে একেবারে গায়ের ওপর এসে বসলেন। মুকুন্দ ভাবছিল, সতরঞ্চির বাণ্ডিলটা খুলে বিছানা ছড়িয়ে নিয়েই লম্বা শুয়ে পড়বে—তারপর ঘুম আসুক না আসুক, সে আর নড়ছে না। সন্ধ্যা রাত্রির প্যাসেঞ্জার টিকাতে টিকাতে ভোর নাগাত পৌঁছুবে কাশিমবাজার—এর মধ্যে কত লোক উঠবে, কত লোক নামবে, হুড়োহুড়িতে দু'একবার ঘুম ভাঙবেই, সেই অবকাশে টুক করে নেমে গিয়ে বেলার খোঁজ নিয়ে এলেই চলবে। কিন্তু সহযাত্রী ভদ্রলোকটি যে রকম জাঁকিয়ে বসলেন, তাতে সে আশা তাকে ছাড়তে হল। বুঝলো কপালে কষ্ট আছে। বুঝে বিরক্তও হল।

ভদ্রলোকটি কিন্তু তার বিরক্তি গায়ে মাখলেন না। পকেট থেকে সিগারেটের টিনটা বের করে তিনি ধরলেন মুকুন্দর সামনে। ভদ্রতার খাতিরে মুকুন্দ তুলে নিলে একটি—হাতের খোদলে দেশলাইয়ের কাঠি ধরিয়ে ভদ্রলোক বললেন, নিন শিগ্গী, মেঠো হাওয়ায় এক্ষুনি নিভে যাবে। চল্লিশ কাঠি এক পয়সায়···বুঝেছেন!

তাঁর এই গায়ে-পড়া ভাব দেখে মুকুন্দ কেমন একটু বিব্রত হয়ে পড়লো। কোন মতলব নিয়ে লোকটা তার পিছু নেয়নি ত! কিন্তু দেখে ত দিব্যি ধোপদুরস্ত বাবুটি মনে হয়। যাই হক, একটু সাবধানে থাকতে হবে—ট্রেণে ডাকাতির খবর এই সেদিনও কাগজে বেরিয়েছে।

ভদ্রলোক একটা সিগারেট ধরালেন—তারপর বেশ খানিক ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, মশায়ের বুঝি শ্বশুরবাড়ী যাওয়া হচ্ছে?

মুকুন্দ চমকে উঠলো। কি করে জানলো লোকটা?

ভদ্রলোক একটু হাসলেন। বললেন, অবাক হচ্ছেন? সিল্কের পাঞ্জাবী, গরদের চাদর, সোনার বোতাম, পেটেণ্ট লেদার পম্প-স্যু··· এ-সব একেলে ছোকরারা পরে ত শ্বশুরবাড়ী যাবার জন্যেই। বুঝছেন না! তা মশায়ের যাওয়া হবে কত দূর?

মুকুন্দ সলজ্জমুখে বললে, মুর্শিদাবাদ।

ভদ্রলোক বললেন, আহা মুর্শিদাবাদের এলাকা ত নেহাৎ ছোট নয়। জায়গাটা কি?

মুকুন্দ নিস্তেজ গলায় বললে, কাশিমবাজার!

ওঃ বলে ভদ্রলোক চোখ বুঁজে দিলেন সিগারেটে আরো গোটা দুই টান। তারপর বললেন, আমিও যাচ্ছি কাছাকাছিই—একসঙ্গে যাওয়া যাবেখন।

সর্ব্বনাশ! কিন্তু এরপর আর কিছু না বললে ভালো দেখায় না। মুকুন্দ বললে, আপনি কোথায় যাচ্ছেন?

—এই আপনারই কাছাকাছি আর কি!

—তবু!

—এই ছানার জিলিপির দেশে···বুঝলেন!

—মুড়োগাছায়?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। তা মশায়ের শ্বশুর কি করেন?

—উকিল।

—নামটা কি শুনতে পাই?

—হলধর···

—বন্দ্যোপাধ্যায়?

—কি করে জানলেন?

ভদ্রলোক উদাস দৃষ্টিতে বাইরের দিকে তাকালেন একবার। তারপর বললেন, নামজাদা লোক—জানতে আটকায় কি?

তা বটে। মুকুন্দ অনেকটা আশ্বস্ত হল। কিন্তু মনটা তার খুঁতখুঁত করতে লাগলো—ঘুমানোর আজ আর কোন আশাই নেই। এমন কি, মাঝে মাঝে যে বেলার খোঁজ নিতে যাবে, তারো উপায় হয়ত থাকবে না। কোথা থেকে জুটলো এই শনিগ্রহ! মুড়োগাছায় পৌঁছুতে ত ঢের দেরী—তারপর আর থাকবে ক'টাই বা ষ্টেশন? একেই বলে ভাগ্য!

* * * *

ভদ্রলোক, মুকুন্দর হাত থেকে খবরের কাগজটি টেনে নিয়ে পড়তে সুরু করে দিলেন। পড়া মানে আর কি? এদিকে-ওদিকে বার কয়েক চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললেন, তা মশায়ের স্ত্রী বুঝি বাপের বাড়ীতেই আছেন? আর তাঁকে নিয়ে আসতেই বুঝি এই যাত্রা?

—আজ্ঞে না। তিনি সঙ্গেই আছেন—চলেছেন বাপের বাড়ীতে, বোনের বিয়ে।

—ওঃ। তা তাঁকে জানানা গাড়ীতে ভেজে দিলেন কি জন্যে? মশায় বুঝি পর্দ্দাবাদী?

মুকুন্দ মিষ্টি করে হেসে বললো, মোটেই না। পর্দ্দার ওপর আমি হাড়ে-চটা—মেয়ে গাড়ীতে চলেছেন স্ত্রীর একটি বান্ধবী, তাঁরি টানে গিয়ে উঠলেন আর কি!

ভদ্রলোক অলস দৃষ্টিতে বাইরে তাকিয়ে একটা হাই তুললেন সশব্দে। তারপর বললেন, বুঝলাম। তা ওরাও কি যাচ্ছেন কাশিমবাজারেই?

—তা ত বলতে পারি নে। তার স্বামীর সঙ্গে আমার আলাপ নেই। শেয়ালদায় গাড়ীতে উঠতে যাচ্ছি—প্লাটফর্ম্মে দু'জনে দেখা—তারপর কে তার স্বামী, কে বা আমি? জমে গেলেন—শেষটা দু'জনে উঠলেন গিয়ে মেয়ে গাড়ীতে, অনেক কালের সব প্রাণের কথা বলাবলি হবে ত! গতিক দেখে আমরা দু'জনে মোটঘাট নিয়ে দুটো কামরা দখল করলাম—কি আর করি বলুন?

ভদ্রলোক হো-হো করে হেসে উঠলেন। গলা খাটো করে বললেন, মেয়েদের মনের গতি...ওর মর্ম্ম কে বুঝবে বলুন?

একটু দম নিয়ে বললেন, তা একটা সুবিধা হয়েছে আপনার। আপনাকে আর ছুটে ছুটে খোঁজ নিতে যেতে হবে না—তাঁর স্বামীই খোঁজ-খবর করবেন। অবশ্য কতদূর ওঁরা যাবেন, সেটা জানা দরকার।

মুকুন্দ বললে, বটেই ত!

ভদ্রলোক বললেন, ব্যস্ত হবার দরকার নেই। রাণাঘাট পর্য্যন্ত ত চলুন, তারপর একবার ঢুঁ দিয়ে আসবেন।

অপ্রসন্ন মুখে মুকুন্দ বললে, তাই হবে। একটু আমতা আমতা করে বললে, ওঁরা বেলডাঙ্গা পর্য্যন্ত যাবেনই, উড়ো-উড়ি ঐ রকমই কি যেন একটা কথা শুনছিলাম।

—তাহলে ত ভালোই।

দু'জনে খানিক চুপচাপ।

প্রথমটা মুকুন্দর মনে জেগেছিল একটা সন্দেহ। কেমন একটা ভয়-ভয় ভাব। কিন্তু ইতিমধ্যে অনেকটা পথ একত্রে এসে, আর গল্পসল্প করে, তার মনের আড়ষ্ট ভাবটা কেটে গেছে। এখন সে বুঝেছে, ভদ্রলোকটি বেশ মাইডিয়ার শ্রেণীর লোক এবং আর যাই করুন, কোন অনিষ্ট ইনি করবেন না। শুধু মনটা তার কেমন যেন মুচড়ে মুচড়ে উঠতে লাগলো—বেলা হয়ত বিরক্ত হবে। কিন্তু ভদ্রলোকের এতখানি আন্তরিকতা এড়িয়ে যাওয়াই বা যায় কি করে? তা ছাড়া এত কাল পরে দুই কলেজী বন্ধুতে দেখা হয়েছে, কত মনের কথাই হচ্ছে। এর ভেতর ঘন ঘন গিয়ে বাধা সৃষ্টি করলে, হয়ত দু'জনেরই বিশ্রী লাগবে!

ভদ্রলোক আবার সিগারেটের টিন বার করলেন এবং এগিয়ে ধরে বললেন, এবার একটু চায়ের যোগাড় করা যাক, কি বলেন?

কি আর বলবে মুকুন্দ? বললে, মন্দ কি? তা আপনি বসুন—আমিই দেখছি।

—আহা না না ...আপনি বসুন, নিশ্চিন্ত হয়ে বসুন। আমিই করছি সব যোগাড়-যন্ত্র।

একটা ষ্টেশনে গাড়ী থামতেই তিনি নেমে গেলেন। যাবার মুখে বলে গেলেন, জিনিষপত্রগুলো রইলো -দেখবেন যেন।

বেকুব হয়ে বসে রইলো মুকুন্দ। ভদ্রলোক দিব্যি তার ঘাড়ে চাপিয়ে গেলেন আপন মলপত্তর এবং নিজে বেরুলেন চায়ের যোগাড় করতে। কি আশ্চর্য্য! একবার যে স্ত্রীর খবর নেবে, সে রাস্তাটি বন্ধ, একটু হাত পা ছড়িয়ে যে ঘুমুবে, তারো উপায় নেই। অথচ লোকটিকে লাগছেও মন্দ নয়!

হন্তদন্ত হয়ে এলেন ভদ্রলোক, চ্যাঙাড়ী ভর্ত্তি খাবার, মাটির গেলাস-ভরা চা, আর কলার পাতে জড়ানো পানের খিলি নিয়ে। দরজাটি বন্ধ করেই বললেন, গিয়েছিল গাড়ী ফেল হয়ে! দৌড়ুতে দৌড়ুতে কোন রকমে এসে পড়েছি—নইলে বুঝুন কি হালটা আমার হত!

তারপর মুকুন্দর খবরের কাগজখানি দো-ভাঁজ করে বিছিয়ে, তারই ওপর খাবার আর চা-পান রেখে বললেন, লেগে যান।

এমন সহৃদয়তার সঙ্গেই বললেন যে মুকুন্দর আর কিছু বলবার রইলো না! হাত বাড়াতেই হল।

ভদ্রলোকও লেগে গেলেন পূর্ণোদ্যমে।

গাড়ীতে স্ত্রী-পুরুষ, মোট-ঘাট নেহাৎ মন্দ জমেনি ইতিমধ্যে। শেয়ালদায় গাড়ী ছিল একদম ফাঁকা—দুটি একটি লোক, সবই কলিকাতা অঞ্চলের। তারা কখন নেমে গেছে। এতক্ষণে উঠেছে গাড়ীতে নির্ভেজাল মফঃস্বলী লোক—তাদের কথাবার্ত্তা ও কোলাহলে গাড়ীর কামরা মুখরিত হয়ে উঠেছে। মামলা-মোকদ্দমার কথা, জমি-জায়গা, চাষ-আবাদের

কথা, অনুপস্থিত—কোন অসৎ লোকেব চরিত্র নিয়ে সমালোচনা—তারি ফাঁকে ফাঁকে এক-আধ ঝলক ঠাট্টা-ইয়ার্কি, এক-আধ কলি গান এলোমেলো ভাবে ভেসে আসছে। সহুরে মুকুন্দ কান পেতে শুনছে, মাঝে মাঝে অন্ধকারে অবলুপ্ত মাঠ ও বনের দিকে চোখ চালিয়ে দিচ্ছে, বেশ লাগছে তার রাত্রিটা। ঘুম না হক, অন্ততঃ চুপ করে বসে থাকতে পাবলেও হত! কিন্তু উপায় কি?

ভদ্রলোকটি বললেন, ঘুম আসছে নাকি?

ক্ষীণ গলায় জবাব দিলে মুকুন্দ, একটু একটু।

আস্তে ব্যস্তে তিনি বললেন, আহা কেন কষ্ট করছেন? শুয়ে পড়ুন না। আপনার স্ত্রী ত আর নেহাৎ ছেলে মানুষটি নন—তিনি কিচ্ছু ভয় পাবেন না। তা ছাড়া এ সব অঞ্চল অতি নিরীহ...মানুষ খেতে পায় না, পেটে হাত দিয়ে মরে যায়—তবু কেড়ে কামড়ে খেতে জানে না। কোন ভাবনা নেই আপনার—লম্বা ঘুম লাগান, আমি ত জেগে রইলাম। নামার আগে ডেকে দিয়ে যাবো।

—একবার...

—আরে না না মশায়। মেয়েদের একটু স্বাবলম্বী হতে দিন। এতই বা কেন উদ্বেগ আপনার? আত্মরক্ষা করার কোন শক্তিই কি ওদের নেই মনে করেন? আমরা ছেড়ে দিই না, সুযোগ দিই না, তাইতেই না ওরা এমন প্যানপেনে হয়ে পড়েছে!

অগত্যা মুকুন্দকে শুতে হল।

*   *   *   *

ধড়মড় করে জেগে উঠেই মুকুন্দ দেখে গাড়া একদম ফাঁকা—এক কোণায় বসে আছে চাষী গোছের একটি বৃদ্ধ। ছোট্ট একটি থেলো হুঁকোয় টানছে তামাক। রাত্রির আকাশ ফিকে হয়ে এসেছে—

জানালা দিয়ে আসছে ভোরের অস্পষ্ট আভাষ। হতভম্ব হয়ে জিজ্ঞাসা করলে সে, কোন ষ্টেশন গেছে গো মুরুব্বি ?

বুড়ো কাশতে কাশতে বললে, বহরমপুর কোর্ট গো বাবু।

—অ্যাঁ! তাহলে ত এবার কাশিমবাজার!

—হ্যাঁ গো বাবু।

হঠাৎ তাকিয়ে দেখে মুকুন্দ যে মাথার শিয়রে তার স্যুটকেসটি নেই, পেষ্টবোর্ডের বাক্সটি নেই— বাক্সের ওপর তোয়ালে জড়ানো একটা পুঁটলি ছিল, তা নেই। নীচেয় তাকিয়ে দেখে, জুতো জোড়া নেই—পকেটের পেন, চোখের চশমা, হাতের ঘড়ি, সবই নিরুদ্দিষ্ট, অন্ধকারে ভেগেছে। সে শুধু শুয়ে আছে সতরঞ্চটির ওপর—আর মুখের কাছে ভোরের হাওয়া লেগে পৎ পৎ করে উড়ছে সেই ভাঁজ-করা খবরের কাগজখানা।

প্রথমটা থতমত খেয়ে গেল মুকুন্দ। তারপর বুঝলো, সেই মুড়োগাছার লোকটিই তাকে সর্ব্বস্বান্ত করে গেছে। অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত গল্প করে সে ক্লান্ত হয়ে ঠাণ্ডা হাওয়ায় ঘুমিয়ে পড়েছে, সেই সুযোগে সমস্ত জিনিষপাতি নিয়ে লোকটি দিয়েছে চম্পট! টাকা-পয়সা সব ছিল স্যুটকেসে, কাপড়-জামা ছিল কাগজের বাক্সে—সর্ব্বস্ব গেছে। এমন কি জুতো জোড়া পর্য্যন্ত নেই। এখন বাড়ী ফেরাও অসম্ভব, শ্বশুর বাড়ী গিয়ে ওঠাও কঠিন। হঠাৎ মনে পড়লো, বেলা কি করছে কে জানে! সে যখন শুনবে এই সব, কি মনে করবে সে? রাগে, দুঃখে, লজ্জায় মুকুন্দর কান্না পেতে লাগলো—মনে হতে লাগলো, চলন্ত ট্রেণ থেকেই দেয় এক লাফ!

গাড়ী থামতেই খালি পায়ে মুকুন্দ তড়াক করে নেমে পড়ে দিলে এক ছুট—মেয়ে গাড়ীর দিকে। পরের পর দুটো কামরা—সম্পূর্ণ খালি, জন প্রাণী নেই! অ্যাঁ? বেলা কোথায় গেল, বেলা?

পেটের ভেতরটা ঘুলিয়ে উঠলো—কপাল দিয়ে চুঁইয়ে নামতে লাগলো ঘাম, আর সমস্ত মাথাটা ঘুরতে লাগলো বোঁ-বোঁ করে। কোন রকমে একটা লাইট-পোষ্ট ধরে মুকুন্দ বসে পড়লো। এখন উপায়? কোথায় যায় সে, কাকে ডাকে, কি বলে? হায়, হায়, কি বোকামিই সে করেছে, একটা শয়তানের ওপর বিশ্বাস করে! নিজের সর্ব্বস্ব এবং স্ত্রী পর্য্যন্ত ট্রেণে খুইয়ে কোন মুখে আজ সে আত্মীয়স্বজনের মধ্যে, নয়ত শ্বশুর বাড়ীতে গিয়ে দাঁড়াবে? আর যাবেই বা কি নিয়ে? পয়সা ত একটি নেই হাতে!

ট্রেণ বেরিয়ে গেল। বুকপকেট থেকে টিকিটটি বের করে দরজায় দেখিয়ে, সতরঞ্চটি ঘাড়ে খালি পায়ে চললো মুকুন্দ—ভাবতে ভাবতে চললো, কি কৈফিয়ৎ দিয়ে শ্বশুরবাড়ীতে ব্যাপারটা সে মানিয়ে নেবে! বিভ্রান্ত বেয়াকুব মুকুন্দ কিছুই ত ভেবে পায় না!

সকাল হয়েছে ততক্ষণে। সেই ভয়াবহ শূন্য সকালে কাশিমবাজারের বুনো পথ ধরে একা একা চললো মুকুন্দ। দু-ধারে খাল বিল, ভিজে ভিজে গেছো গন্ধ আসছে একটা, দু-একটা লোক চলেছে দূরে দূরে।

* * * *

মেজো শালী লক্ষ্মী মুকুন্দকে দেখতে পেয়েই ছো মেরে তাকে নিয়ে গেল ওপরের ঘরে। মুকুন্দর তখন বুক ধুক ধুক করছে, গলা গেছে শুকিয়ে কাঠ হয়ে। মনে হচ্ছে, কোন কথা বলতে গেলেই সে হু-হু করে ডুকরে কেঁদে উঠবে।

লক্ষ্মী বললো, অমন পা টিপে টিপে আসা হচ্ছিল কেন? তা বেলী কৈ? তাকে যে বড় নিয়ে এলেন না?

মুকুন্দ ব্যা ব্যা করে খানিকটা চেষ্টা করে বললে, মানে, মানে, তার শরীরটা···মানে, মানে, শীগ্রী আসবে আমার ছোট ভাইয়ের সঙ্গে।

লক্ষ্মী বললো, এ আপনার ভারী অন্যায়! অনুর বিয়ে—ঐটি

আমাদের সবার ছোট বোন—আর তার বিয়েতেই আনলেন না বেলীকে! পুরুষ মানুষদের বুদ্ধিই এই রকম।

মুকুন্দ শুধু একটু কাষ্ঠ হাসি হাসলো।

হঠাৎ লক্ষ্মী অবাক হয়ে বললে, জামার বোতাম কি হল? বুক খালি করে শ্বশুর বাড়ী এসেছেন!

—মানে বোতামটা আসবার সময়, মানে, মানে···

—চশমাটাও ত দেখছি না।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, চশমাটা······

—আর ঘড়ি? সব বুঝি চোরে নিয়েছে গাড়ী থেকে?

—না না চোরে নেবে কেন? আছে একটা···মানে একটা···

—কি সেই একটা শুনিই না।

মুকুন্দ আর পেরে ওঠে না। হঠাৎ মরিয়া হয়ে সে বলে দেয়, একজনকে দিয়েছি ট্রেণে—এক বুড়ো ব্রাহ্মণ, কন্যাদায়ে পড়েছেন, বড্ডই ধরলেন।

ফিক করে হেসে লক্ষ্মী বললে, তাকে ঘড়ি দিলেন, চশমা দিলেন, বোতাম দিলেন, কিন্তু পায়ের জুতো জোড়াটাও দিলেন কি বলে?

নিজের খালি পায়ের দিকে একবার তাকিয়ে, মুকুন্দ বুঝলো, তার কৈফিয়ৎটা লক্ষ্মীর মনের মতো হয় নি। কিন্তু কি আর উপায়? সে মুখে হাসিটুকু বজায় রেখেই চুপ করে রইলো।

লক্ষ্মী ও-প্রসঙ্গ চাপা দিয়ে বললে, বেলীকে না আনায় মা-বাবা কিন্তু খুব রাগ করবেন। কত দিন গেছে বেচারী···তা ছাড়া অনি চলে যাবে, তার সঙ্গে একবার দেখা হল না, সে-ও কেঁদে মরবে!

মুকুন্দর বুক ভেঙে উঠে আসতে চায় কাতর একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস। কোথায় বেলা···গভীর রাত্রে কোন দুর্ব্বৃত্ত নিয়ে গেছে তাকে ট্রেণ থেকে চুরি করে!

লক্ষ্মী বললো, সারারাত্রি ট্রেণে এসেছেন—স্নান টান সেরে নিন, তারপর জল খেয়ে মা-বাবার সঙ্গে দেখা করবেন খন। আমি চানের জল দিতে বলছি গে—আপনি জামা-কাপড় বের করে নিন।

—কোথা থেকে?

—কেন জামা-কাপড় আনেন নি কিছু আর?

—এনেছিলাম···মানে···

এবার মুকুন্দর কেঁদে ফেলার অবস্থা। এতক্ষণ কোন রকমে সে চালিয়ে এসেছে—কিন্তু আর কতক্ষণ সে দেবে লক্ষ্মীর এই বেয়াড়া ক্রস-এগজামিনেরজবাব? অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে সে টাল সামলাতে লাগলো।

হঠাৎ বছর পঁচিশের একটি যুবক এসে ঢুকলো ঘরে—রীতিমতো ইংরেজী পোষাক পরণে, গায়ে ভারী ওভারকোট, মাথায় হ্যাট, চোখে নীল চশমা। এদিক-ওদিক তাকিয়ে সে সিধে লক্ষ্মীর কাছে এগিয়ে এসে, তার গলাটি জড়িয়ে ধরে, কানে কানে কি যেন বললে ফিস ফিস করে।

মুকুন্দ ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইলো—এখানে তার থাকা উচিত, না চলে যাওয়া শোভন, তা-ও বুঝতে পারলো না। লক্ষ্মীর স্বামীকে সে দেখেছে—সে ভদ্রলোক ত এ নয়, এ বাড়ীর আত্মীয় কেউ হলেও সে চিনতে পারতো। তবে এ কি ব্যাপার?

লক্ষ্মী বললে, আপনার সঙ্গে ইনট্রোডিউস করিয়ে দিই। ইনি মিঃ জাহাঙ্গীর—আমার লাভার, এসেছিলেন ক'দিন, আজ চলে যাচ্ছেন। জাহাঙ্গীর হাতটি বাড়িয়ে দিলেন—আড়ষ্ট হাতে মুকুন্দ নিলে তাঁর হাতখানি। কিন্তু বিস্ময়ে আর বিরক্তিতে তার সমস্ত শরীর পাক খেতে লাগলো।

লক্ষ্মী বললে, আচ্ছা জাহাঙ্গীর, তুমি তা হলে যাও—নইলে ট্রেণ পাবে না। কিন্তু মনে থাকে যেন ডিয়ার, আমার সেই ব্রেসলেটের কথা।

জাহাঙ্গীর শুধু ঘাড় নাড়লো, তারপর মুকুন্দর দিকে তাকিয়ে লক্ষ্মীর গালে সশব্দে একটি চুমো খেয়েই জোর পায়ে বেরিয়ে গেল।

মুকুন্দর মনের অবস্থা তেমন নয়, তবু সে নিজেকে সামলে রাখতে পারলো না। বললে, লক্ষ্মীদি, তোমরা বনিয়াদী ভদ্র ঘর—বিয়েও হয়েছে তোমার যোগ্যপাত্রে, কিন্তু এ কি কাণ্ড? আর বাপের বাড়ীর বুকের ওপর বসেই চালাচ্ছো এই সব কাণ্ড—তোমার মা-বাবা...

লক্ষ্মী দরাজ হাসিতে ফেটে পড়ে বললো, তার আর হয়েছে কি? স্বামীকে আমার যদি পছন্দ না হয়, আমি যদি অন্যকে পেয়ে সুখী হই, তাকে কেন accept করবো না? আর আমার স্বাধীন ইচ্ছায় বাধা দেবারই বা বাবা-মা'র অধিকার কি?

—ভালো কথা। কিন্তু ভদ্রসমাজে এটা চলে না।

—যেখানে চলে না, সে সমাজকে আমিও মানি না। নিজের স্বাধীন ইচ্ছের গলা টিপে যে সমাজ···

—থাক লক্ষ্মীদি, ও সব থিয়েটারী বক্তৃতা শোনার মতো মনের অবস্থা আমার নেই। কিন্তু একটা কথা—আমার সামনে ও ব্যাপারটা না হলেও কি চলতো না? আমরা সায়েব নই, নেহাৎ বাঙালী—আমাদের মতে ওটা অভদ্রতা!

—হবে।

লক্ষ্মী যেন গ্রাহ্যই করলো না। আগের কথার জের টেনেই সে বললো, আচ্ছা বসুন, আসছি—আপনার চানের ব্যবস্থা করি, কাপড়টাপড় দিতে বলি।

*　　*　　*　　*

লক্ষ্মী বেরিয়ে যাবার পরই খালি গায়ে লোমশ ভুঁড়ি নিয়ে যে লোকটি ঘরে ঢুকলেন, তাঁকে দেখেই মুকুন্দ একেবারে আঁৎকে উঠলো। সেই মুড়োগাছার ভদ্রলোক!

—কি ব্রাদার ?

—আপনি, আপনি, চোর…চোর…

—বাঁধকে ভাই, বাঁধকে। ভেবেছিলাম, নিরাপদ দূরত্বে সরে পড়েছি। এখন দেখছি দৈবাৎ এক জায়গাতেই এসে পড়েছি। বড়ই বেকায়দা হয়ে গেছে ত !

—আমাকে, আমাকে…আপনাকে…দাড়ান আপনার ব্যবস্থা করছি আমি।

—ব্যস্ত হয়ে লাভ কি ব্রাদার ? এবাড়ী যে আমারও শ্বশুরবাড়ী।

—অ্যাঁ !

—আজ্ঞে হ্যাঁ ব্রাদার। হুজুরের বিয়ের সময় আসতে পারি নি—পরেও আর দেখাশুনা হয় নি। একখানা ফটোগ্রাফ দেখেছিলাম, তাইতেই ট্রেণে শ্রীমূর্ত্তি দেখবামাত্র চিনতে পারলাম। তারপর কথাবার্ত্তায় সমস্ত তল্লাস নিয়ে, ঠিক করলাম একটু রসিকতা করবো। বার দুই যে পান-চা আনতে গেলাম, সে কি জন্যে ? ঐ ফাঁকে বেলীর সঙ্গে দেখাশুনো করে এলাম। এদিকে দয়াময়কে গাড়ী থেকে নামতেই দিলাম না—তারপর বেশী রাত্রে হুজুর যখন নাক ডাকিয়ে ঘুম দিলেন, সেই ফাঁকে সমস্ত লট-বহর বেঁধে ছেঁদে তৈরী করে রাখলাম,—বহরমপুর তক্ এসেও দেখি মহাশয়ের ঘুম চলেছে দিব্যি—আর কি ? স্থট করে নিয়ে সব নেমে পড়লাম, তারপর বেলীকে গিয়ে তাড়া লাগালাম, নেমে আয়—মুকুন্দ বাইরে গাড়ী ঠিক করতে গেছে। তারপর সিধে শ্বশুরবাড়ী মুখো !

মুকুন্দ হেসে ফেললো।

বললে, রক্ষে হক। আমি ত ভয়েই সারা। মালপত্তর সোনাদানা সব খুইয়ে শুধু সতরঞ্চিটি ঘাড়ে করে বেরুলাম—পথে সেটাও ফেলে

দিতে হল মানের দায়ে—তারপর এখানে এসে উঠলাম, আর এসেই পড়লাম লক্ষ্মীদির পাল্লায় !

—তাকে কি বলা হল ?

লজ্জিত মুখে মুকুন্দ বললে, রাজ্যের মিথ্যে কথা বলতে হল। এখন তার কাছে মুখ দেখাই কি করে, তাই ভাবনা !

হ্যা, ভদ্রলোক বললেন, মেয়েছেলের কাছে মিথ্যে কথা বলতে যারা ভয় পায়, আর বলে তাল সামলাতে না পারে, তারা পুরুষমানুষই নয়।··· যাকগে ব্রাদার, তা খেলটা কি রকম হয়েছে ?

—মন্দ নয়। কিন্তু মশায়ের এইটাই কি পেশা ?

—এটা আজেন্ডিক—এরি সঙ্গে আছে অবশ্য চাকরী এবং সেটাও চলে মন্দ না।

—তা একটি ভদ্রলোককে, বিশেষ করে আত্মীয়কে এ রকম নাকাল করে···

—আহা ঐ টুকুই ত মাধুর্য্য। তা নাকাল আমিও বড় কম হইনি। বাড়ী এসেই সমস্ত আবহাওয়াটা তৈরী করতে হয়েছে। তারপর কোমর বেঁধে লাগতে হয়েছে বেলীকে make-up করাতে···

—মানে ?

—মানে একটু আগে যে সাহেবটিকে দেখলেন, উনিই হলেন আপনার মহামহিমময়ী শ্রীমতী বেলা দেবী···

—অ্যা ?

—আজ্ঞে হ্যা স্যার।

* * * *

ইতিমধ্যে বেলা আর লক্ষ্মী এসে হাজির। দু'জনে খালি হি-হি করে হাসছে মুখে কাপড় গুঁজে।

মুকুন্দ হিংস্র দৃষ্টিতে একবার বেলার দিকে তাকালো, তারপর গম্ভীর গলায় বললো, আমি স্নান করবো—মাথা ধরেছে।

যাদুবাবুর বিরক্তি

আজ আবার স্নুরু হয়েছে। বিরক্ত হয়ে যাদুবাবু এলেন বাইরের ঘরে। আজ একটা হেস্তনেস্ত না করে আর ছাড়াছাড়ি নেই।

বাইরের ঘরে বড় ছেলে গবু আর মেয়ে পানি হাঁ করে বসে আছে ছাদের দিকে তাকিয়ে। সামনে খোলা রয়েছে বই-খাতা অনেক গুলো—কিন্তু মন তাদের গেছে সে রাজ্য ছেড়ে বহু দূরে।

চোখ রাঙিয়ে যাদুবাবু বললেন, হতভাগার দল, লেখাপড়া নেই সন্ধ্যে বেলা।

গবু ভয়ে ভয়ে সামনের একটা বই টেনে নিলে এবং মাঝখান থেকে এলোপাথাড়ি পড়া স্নুরু করে দিল। পানি কিন্তু অত সহজে কাবু হবার পাত্র নয়—সোজা জবাব দিলে, আমরা কি করবো? বই নিয়ে যেই বসেছি, অমনি...

ঠিকই ত! ওদের দোষ কি? মাথার ওপর অতবড় ব্যাপার নিত্য নিয়ত ধারাবাহিক ভাবে চলতে থাকলে কখনো পড়াশুনা করা যায়? ছেলেমানুষ ত...এমনেই মন চঞ্চল, তার উপর যদি আবার এই...

বাস্তবিকই কি অন্যায় এই বাড়ীওয়ালাদের! এরা ভাবতেই পারে না যে যারা ভাড়া দিয়ে থাকে, তারাও মানুষ—তাদের স্নুবিধা-অস্নুবিধা পছন্দ-অপছন্দ সম্বন্ধে ওদের কোনই মাথাব্যথা নেই, অথচ ভাড়াটির দিক বেশ লোভ আছে। তখন ত মাস কাবার হতে তর সয়না!

সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মনে পড়লো, দেয়ালের একটা গা-নল থেকে চুঁইয়ে জলপড়া মেরামত করার জন্যে কুড়িদিন তাগাদা দিয়েও কোন ফল হয় নি—কলতলার একটা দিক সাৎলায় ভরে গেছে, জল পড়ে পড়ে হয়েছে বেজায় ঢালু—চলা-ফেরার সময় বুক দুর দুর করে। পঞ্চাশবার বলেও তার কোন ব্যবস্থা হয় নি। রান্নাঘরের দুটো তাক অব্যবহার্য্য হয়ে রয়েছে, বাথরুমের টানা-দরজার একটা কব্জা আল্গা হয়ে আছে—সিসটার্ণে এক এক দিন জল আসে না, তারপর সেদিন গেছে ছেকলটি ছিঁড়ে। এত উপদ্রব সয়েও ভাড়া দিয়ে এই বাড়ীতে রয়েছেন, তার কারণ বাড়ীটা এমনে যাই হক, তাঁর অফিসভাগ্যের দিক থেকে মন্দ পয়া নয়। কিন্তু আর চলে না···যদিও বা চলতো, এই নূতন আপদেই আর চলতে দিলে না।

উত্তেজনায় যাদুবাবু ঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দায় এলেন—সেখান থেকে তাকালেন দোতালার দিকে। রেলিং-এর গায়ে ভর দিয়ে দু'তিনটি মেয়ে দাঁড়িয়ে নীচের উঠনে কার সঙ্গে কথা কইছেন। বোধ হয় পাশের ব্লকের ভাড়াটে কেষ্টবাবুর গিন্নীর সঙ্গে!

সসঙ্কোচে ফিরে এলেন ভেতরে। বললেন, নাঃ এ বাড়ীতে আর থাকছি না। এখানে থাকা পোষায় কেষ্টবাবুরই—যিনি ছ'মাসের ভেতর ভাড়া দেন না এবং তাগাদা করলে বলেন, ব্যস্ত কি? আপনার বাড়ী আপনারই রইলো, আমি ত আর মাথায় করে নিয়ে যাচ্ছি নে। আমার জিনিষপত্র, বৌ-ছেলে সবই ত রয়েছে আপনার কাছে গচ্ছিত—ভয়টা কিসের?

বাড়ীওয়ালা মহোদয় যদি অভাবের অজুহাত দেখান, সঙ্গে সঙ্গে কেষ্টবাবুর উত্তর তৈরী—কি যে বলেন তার ঠিক নেই! এত বড় বাড়ী যার, তার আবার অভাব! যদি বলেন, টাকা ত আপনাদের হাতে—আপনারা যদি না দেন, তাহলে আমি কি বাড়ী চেটে খাবো? কেষ্টবাবু

অম্নি উত্তর দেন, কেন, বাড়ী দেখিয়ে আপনি ত স্বচ্ছন্দেই মোটা টাকা হাওলাত নিতে পারেন!

এখানে থাকা পোষায় ভারি। কোন আত্মমর্য্যাদা সম্পন্ন লোক ও রকম ধাষ্টেমো করতে পারেন না। বাড়ীতে থাকলে ভাড়া তাঁকে দিতেই হবে—তা না দিয়ে, মাঝপথে দাঁড়িয়ে চেঁচামেচি করা এবং রাজ্যের লোককে ঝেঁটিয়ে ঘরে এনে তোলা ত আর তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়! কেউ বলবে, আহা মশায় না পোষায় উঠে যান না। কেউ বলবে, দেখেই ত এসেছেন—এখন অসুবিধা বললে চলবে কেন? কেউ বা বলবে, ভাড়া না দেবার মৎলব আর কি! কেউ কেউ অবশ্য পক্ষ নেবে এবং বাড়ী-ওয়ালা জাতির উদ্দেশে যথোচিত মন্তব্য করতেও সুরু করবে। সেই সব ব্যাপার কল্পনায় ভাবতেই যাদুবাবুর কাণ লজ্জায় লাল হয়ে ওঠে। অথচ বাড়ীওয়ালা সম্প্রদায়কে জব্দ করার ত আর কোন ওষধও নেই।

উত্তেজনায় ভদ্রলোক ঘর আর বার করছেন। এহেন সময়ে আবার গিন্নীর পাত্তা নেই—তিনি যে কোথায় সটকে পড়েছেন, অনেক চেষ্টা করেও যাদুবাবু তার কিনারা করতে পারলেন না। এতে তাঁর বিরক্তি গেল আরো বেড়ে। এই বাসা তাঁকে বদলাতে হবে আরো আগে, শুধু গিন্নীর জন্যেই - ঐ এক ব্যাটা কে অবধূত এসেছে আড্ডিদের বাড়ীতে, রোজ সন্ধ্যায় দুনিয়ার মেয়েছেলে জড়ো করে সুর করে ভাগবত না কি পড়ে, আর মেয়েরাও টাকাটা সিকিটা তার পাদপদ্মে জুগিয়ে পরম তৃপ্তি লাভ করে—অকর্ম্মণ্য বুড়ো বলদ একটা—ধর্ম্মের কি বোঝে সে? আর গৃহিণী···তিনিই বা ও-রাজ্যের কি ধার ধারেন? অথচ প্রত্যেক দিন সন্ধ্যাবেলা ঘড়ি ধরে তাঁর সেখানে হাজিরা দেওয়া চাইই। ওদিকে একলাই যেতেন, এখন আবার ছোট মেয়ে পটলী আর মেজো ছেলে বুলুকেও নিয়ে যেতে সুরু করেছেন। এই ছোট্ট বেলা থেকেই ওদের মধ্যে ঢোকাচ্ছেন ভণ্ডামির বিষ—ওরা শিখছে, কিছু না করেও

বসে বসে অন্যের ঘাড় ভেঙে সেবা আদায় করা যায়। শিখছে, এক ফোঁটা বিদ্যে না নিয়েও দুনিয়ার লোকের প্রণাম আত্মসাৎ করা চলে। সর্ব্বনাশ হল আর কি!

বিরক্তি আর উত্তেজনা আর রাগে অস্থির হয়ে যাদুবাবু ঠিক করে ফেললেন একটি কায়েমি মৎলব। আজই তিনি বাড়ীওয়ালাকে দিয়ে দেবেন নোটীশ—আগামী সাত দিনেই তিনি উঠে যাবেন এবং কোন অজুহাতই শুনবেন না। কিন্তু যাবেন কোথায়? সবদিক থেকে সুবিধাজনক, অথচ ভাড়ার ব্যাপারে অসুবিধাজনক নয়, এমন একটা বাড়ী—আর সেটা খাস বড় রাস্তার ওপর না হয়, অথচ ট্রাম-রাস্তার গায়েই হয়—বল বলতেই পাওয়া যায় কি করে? বাড়ী খোজা ত কলকাতায় একটা পরিস্থিতি বললেই চলে!

হঠাৎ মনে পড়ে গেল বন্ধু আশু ভটচায্যির কথা। তার একটা নূতন বাড়ী তৈরী হয়েছে, ভাড়াটে এখনো আসেনি—সেখানে উঠে গেলে কেমন হয়? মন্দ কি! তাই করা যাবে ..কালই তাকে বলবেন।

হ্যাঁ, যে বিশেষ উপদ্রব নিয়ে এই বিভ্রাটের সূচনা, তা কিন্তু এখনো পূর্ণোদ্যমেই চলছে। বরং ইতিমধ্যেই তার জবরদস্তি আরো বেড়ে গেছে। চটে গিয়ে যাদুবাবু হাঁকলেন, গবা?

বই থেকে চোখ তুলে ভয়ে ভয়ে গবু বাবার দিকে চাইলো। যাদুবাবু বললেন, কালি-কলম আছে তোর?

— আছে বাবা।

—লেখ।

—কোন লেখা নেই বাবা কালকে। ফাষ্ট ঘণ্টায় হিষ্টিরি, সেকেণ্ড ঘণ্টায় অঙ্ক...

—ধেৎ গাধা কোথাকার! বলছি একটা চিঠি লেখ।

—কাকে বাবা? বড় পিসিমাকে?

—না রে রাস্কেল, না। আমি বলে যাচ্ছি, তুই শুধু লিখে যা—পরিষ্কার করে লিখবি, আর বানান ভুল করিসনে, বুঝেছিস!

বলির পাঁঠার মতো খাতার পাতা ছিঁড়ে গবু কলম নিয়ে বসলো। পানি বললো, আমায় বলো না বাবা, আমি লিখছি—দাদার লেখা ভালো নয়, ও বেশী নম্বর পায় না হাতের লেখায়।

হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন যাদুবাবু, চুপ কর হারামজাদী, সব তাতেই রেষারেষি দাদার সঙ্গে। লেখ গবা—

মহাশয়,

অদ্য ৫ই তারিখে আপনাকে নোটীশ যোগে জানাইতেছি যে আগামী এক সপ্তাহেই আমি আপনার বাড়ী হইতে উঠিয়া যাইব। পুনঃ পুনঃ বলা সত্ত্বেও আপনি কলতলা, বাথরুম, রান্নাঘর, দেয়াল-নল ইত্যাদি মেরামত করিয়া দিলেন না, তদুপরি প্রত্যহ সকাল, দুপুর ও বিকালে রেডিও বাজাইয়া আপনি আমার ছেলে-মেয়েদের লেখাপড়া ও আমার পূজা-আহ্নিক বন্ধ করিয়া দিবার উপক্রম করিয়াছেন। পুনঃ পুনঃ অনুরোধ সত্ত্বেও এই উৎপাতও আপনি বন্ধ করিলেন না। ভাড়া দিয়া থাকিব, অথচ এত জুলুম সহ্য করিব—বিধাতা আমাকে সেই দুর্ভাগ্য হইতে রক্ষা করুন। আমার সহিত যে সদ্ব্যবহার করিয়াছেন এবং নিয়মিত ভাড়া দেওয়া বা কোন হাঙ্গামা না করার প্রতিদানে যে ভাবে আমাকে নাকাল করিয়াছেন, তজ্জন্য কৃতজ্ঞতা লইবেন। আর কি বলিব? ইতি—

তাং ৫ই শ্রাবণ,	ভবদীয়
১৩৪৮	শ্রীযাদুগোপাল ভঞ্জ।

শেষ করে যাদুবাবু বললেন, যা দিয়ে আয় বাড়ীওয়ালা বাবুকে। জ্যাঠামশায়-টশায় বলবি না—শুধু বলবি, বাবা দিয়েছেন—বুঝেছিস?

গবু চিঠি নিয়ে এক লাফে বেরিয়ে গেল। যাদুবাবু রাগে গরগর

করতে লাগলেন—গিন্নী বাড়ী নেই, তার সঙ্গে একটা পরামর্শ পর্য্যন্ত করা হল না!

একটু পরেই সিঁড়িতে চটির শব্দ এবং পার্টিশনের দরজা খুলে চিঠি হাতে এসে হাজির স্বয়ং হরিচরণ বাবু, মানে বাড়ীওয়ালা।

এক মুখ হেসে বারান্দা থেকে হেঁকে তিনি বললেন, ব্যাপার কি যাদুবাবু, হল কি হঠাৎ?

যাদুবাবু বললেন, হবে কি আর? আমি থাকবো না আপনার বাড়ীতে, ব্যস মিটে গেল।

হরিচরণ বাবু হেসেই বলেন, আহা অত সহজে মিটে গেল বললেই কি যায়? আপনাকে আমি ছাড়লে ত উঠে যাবেন!

—তার মানে? আমার ইচ্ছে না থাকলেও আমাকে আপনার বাড়ীতে আটকে রাখবেন নাকি?

—নিশ্চয়।

—তার মানে? আপনার খুসী নাকি?

—অবশ্যই। বাড়ীতে যেমন ভাড়াটের খুসী আছে, তেম্নি ভাড়াটে রাখায় বাড়ীওয়ালার খুসী বলেও ত একটা জিনিস আছে। আপনার মতো ভাড়াটে আমি ছাড়বো মশাই।

—আপনার খুসীর খেসারত আমি জোগাবো কি জন্যে? ঢের দিন ত জুগিয়েছি। কিন্তু আপনি কি আমার সুবিধা-অসুবিধার কথা একবারও ভেবেছেন? কলতলা, বাথরুম ··

হরিচরণ বাবু বাধা দিয়ে বললেন, আহা সে ত কোনকালেই করে দিয়েছি। কলতলায় সিমেণ্ট দেওয়া, রান্নাঘরে তাক-বসানো, গা-নল মেরামত করে দেওয়া, সবই ত হয়ে গেছে—তেতলার ঠাকুর ঘরে টালি বদলে দেওয়া পর্য্যন্ত। বলুন আর কি করবো?

যাদুবাবু চোখ গোল করে বললেন, আপনি কি আমাকে পাগল ঠাওরালেন ?

হরিচরণ হেসে বললেন, অবশ্যই।

চটে উঠে যাদুবাবু বললেন, আপনি কিন্তু ভদ্রতার সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছেন হরিবাবু।

—আপনি যে সত্যিকে মিথ্যে করে দিচ্ছেন যাদুবাবু!

—মোটেই না। কিছুই আপনি করেন নি—করার ইচ্ছেও নেই আপনার। বাড়ীতে থাকি, আর বাড়ীর খবর রাখি না আমি বলতে চান ?

হরিচরণ তেমনি হেসে বললেন, বাড়ীতে আপনি থাকেন না যেন বলতেই বাধ্য হচ্ছি। আপনার স্ত্রীকে জিগ্যেস করুন···

পানি হঠাৎ বললো, হ্যাঁ বাবা, কবেই ত হয়ে গেছে ও-সব।

—আমাকে বলেছিস ?

—না বাবা।

হরিচরণ বাবু হো-হো করে হেসে উঠলেন। বললেন, রেডিও সম্বন্ধেও একটা নিবেদন করে রাখি—আপনি জানানোর পর থেকেই আমি মেয়েদের সকাল-বিকেলে রেডিও বন্ধ রাখতে বলে দিই। এ ক'দিন ত বন্ধই ছিল—পরশু দিন আপনার স্ত্রী গিয়ে বললেন, বেশ দু'বেলা একটু গানটান হত—কাজ-কর্ম্মের ফাঁকে ভালোই লাগতো শুনতে। মেয়েরা তাঁকে জানায়, আপনি বলেছেন বন্ধ রাখতে—শুনে তিনি আজকাল নিজে হাতেই দু'বেলা গিয়ে খুলে দিয়ে আসেন। এই এখনো তিনি ওপরে আছেন—বুঝেছেন!

বলেই হো হো করে অবার হেসে ফটাফট চটির আওয়াজ করতে করতে পার্টিসানের দরজা দিয়ে ভদ্রলোক বেরিয়ে গেলেন। দরজা বন্ধ হয়ে গেল—চটির আওয়াজও গেল আস্তে আস্তে মিলিয়ে।

ঘরে ঢুকে যাদুবাবু দেখলেন, গবু আর পানি আর বুলু ভালো মানুষটির মতো বই নিয়ে বসে আছে—আর ছোট মেয়েকে গিন্নী নিশ্চিন্ত মনে দুধ খাওয়াচ্ছেন ভেতরের রোয়াকে বসে।

অপ্রস্তুত যাদুবাবু হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন, যত সব ইয়ে হয়েছে!

গিন্নী ফিক করে হেসে ফেললেন। বললেন, মাথা খারাপ হল নাকি?

যাদুবাবু দাঁত কিড়িমিড়ি করে বলেন, পানি, আমাকে বলেছিস যে তোর মা ওপরে আছেন? বলেছিস…

পানি সিধে উত্তর দিলে, তুমি কি জিগ্যেস করেছো? তুমি ত খালি বকছো সন্ধ্যে থেকে!

কয়লা

সাধারণত একটার আগে কোন রাত্রে শোওয়া হয় না, সকালে উঠতে রোজই তাই একটু বেলা হয়। বিশেষ ব্যাপারে কোন দিন যদি সকালের এই ঘুমটুকুর ব্যাঘাত হয়, তাহলে শুধু মেজাজই বিগড়ে যায় না, সমস্ত দিন শরীরটাও কেমন ম্যাজ ম্যাজ করে। আমার এই বদ-অভ্যাসটি বাড়ীতে এমন সুপরিচিত যে এটা অমান্য করে না কেউই। সকাল হলেই গৃহিণী আমার ঘরের দরজাটি ভেজিয়ে দিয়ে, ছেলেপুলেদের অন্য ঘরে তাড়িয়ে নিয়ে যান। কোন রকম হৈ-হট্টগোল যাতে না হয়, সেদিকে দৃষ্টিও রাখেন মোটামুটি।

সেদিন কিন্তু ঘুমটা হঠাৎ ভেঙে গেল নিরূপিত সময়ের ঢের আগেই। বাইরের ছোট বারান্দাটি থেকে আসছে কেমন একটা বিরামবিহীন ঠক ঠক শব্দ—কখনো জোরে, কখনো আস্তে, কিন্তু অবিচ্ছিন্ন ধারায় চলেছেই আওয়াজ, ঠক ঠক।

বিরক্ত হয়ে বিছানায় উঠে বসলাম। বন্ধ জানালাটা খুলে দিয়ে দেখি বেলা নেহাৎ মন্দ হয়নি, যদিও আমার ওঠার সময় সেটা নয়। হাঁক দিলাম, শানি, শুনে যাত একবার।

শ্লেট হাতে উল্টো পায়ে নাচতে নাচতে শানি এলো ঘরে। মুখে তার দুষ্টুমি যেন মাখানো। বললাম, ব্যাপার কিরে? সকাল বেলা লেখাপড়া নেই, খটাখট করছিস? বলে দিইছি না···

আস্তে আস্তে শানি বললে, আমরা না বাবা, আমরা ত পড়ছি! এই দেখো না লঘুকরণ করছি।

মুখ খিঁচিয়ে বললাম, তবে এত আওয়াজ করছে কে শুনি?

শানি বললে, বলবো না। মা বারণ করেছে।

কেমন যেন রহস্যের মতো ঠেকলো। আস্তে আস্তে কাছে টেনে নিলাম মেয়েটাকে। তারপর খুব একটু ভালোমানুষের মতো মুখ করে বললাম, চুপি চুপি বলত শুনি কি হচ্ছে!

শানি বললো, মা কাঠ কাঠছে বাবা।

—কাঠ?

—হাঁ বাবা। ঘরে যে এক টুকরো কয়লা নেই। তুমি ত আনিয়ে দিলে না ক'দিনের ভেতর।

বুঝলাম এবং বলাই বাহুল্য প্রসন্ন হলাম। গৃহিণীর হিসাববুদ্ধির ওপর বরাবরই আমার খুব ভরসা। এই কয়লা-সঙ্কটের মধ্যেও তিনি দিব্যি গুল আর ঘুটে দিয়ে প্রতিদিনের রন্ধনপর্ব্বটা চালিয়ে যাচ্ছেন এবং আমাকে খুব কমই তাগিদ দিয়েছেন এজন্যে। সম্প্রতি বোধহয় এ সবেরও অভাব হয়েছে, তাই বাজার থেকে কাঠ আনিয়ে নিয়েছেন ভোলাকে দিয়ে। বেশ, বেশ! সকালে ঘুম ভাঙার দরুণ মনে জমে উঠেছিল যে বিরক্তিটা, অপরিসীম তৃপ্তির ভেতর তাব সমাধি হল দেখে নিজেই খুসী হলাম।

বাজার থেকে ফিরে শানিকে বললাম, তামাক সাজ ত বাবা এক কলকে। আর কাগজখানা নিয়ে আয়। গরু চোরের মতো মুখ করে শানি বললে, কি দিয়ে সাজবো বাবা? কয়লা ত নেই।

হঠাৎ রাগ হয়ে গেল। মেয়েটা দিন দিন ফাজিল হয়ে উঠছে ভয়ানক। স্কুল না ছাড়ালে আর চলছে না দেখছি! ধমক দিয়ে বললাম, পাথুরে কয়লা দিয়ে তামাক খায় বুঝি?, ডেঁপো হয়েছিস ভারী!

খ্যাকশেয়ালীর মতো খ্যাক করে বললে শানি, বারে—শুধু শুধু আমায় বকবে! মা তোমার কয়লা দিয়ে চা তৈরি করলো, আমি কি করবো তার?

তাই ত! এ ব্যাপার ত আমি জানি না—জানলে আসার পথে না হয় এক ঠোঙা কাঠ কয়লা কিনেই আনতাম। বললাম, আচ্ছা যা, কাগজখানা নিয়ে আয়।

শানি নিঃশব্দে রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকলো। বুঝলাম, বেটীর রাগ হয়েছে বকুনি খেয়ে। গোপালকে বললাম, গুপু, আনো ত বাবা কাগজটা, একটু চোখ বুলিয়ে নেই যুদ্ধের পৃষ্ঠাটায়।

গোপাল ফিক্ করে হেসে বললো, কাগজও নেই বাবা। খুকুর দুধ গরম হয়েছে তাই দিয়ে। বললাম, একখানা খবরের কাগজ—আজকাল ছ'পয়সা দাম। তা দিয়ে দুধ গরম করা হল!

গোপাল মুরুব্বিয়ানা করে বললে, খেতে হবে ত। বাজার থেকে কয়লা যে উড়ে গেছে।

বুঝলাম এ কার কথা। একটু হেসে বললাম, তা বটে। তারপর রান্নাঘরের উদ্দেশ্যে হাঁক ছাড়লাম, ওগো, তেল দাও, আর শানিকে বলো কলতলায় জলচৌকিটা দিতে!

এবার ওগো বেরুলেন—সমস্ত মুখ আরক্তিম, চক্ষুদ্বয় জলসিক্ত। উনুন ধরানোর মারাত্মক প্রয়াস আপাদমস্তকে পরিস্ফুট। বললেন, কি ছেলেমানুষী করছো সেই থেকে? জলচৌকি আর বইয়ের র‍্যাকটা দিয়েই ত এ বেলা রান্না হচ্ছে—ভোলাকে পাঠিয়েছিলাম কাঠ আনতে, এসে বললে, পাঁচ টাকা করে মণ।

সবিনয়ে বললাম, বেশ করেছো। অন্যান্য জিনিসও দরকার হলে কেটে উনুনস্থ করো। তা তেল আছে ত, না তা-ও উনুনে ঢালতে হয়েছে।

এবার গৃহিণীর অধরে হাসির রেখা দেখা দিলে। (চার সন্তানের জননীর ক্ষেত্রে অধর কথাটা খাটে ত?) বললেন, তেল আছে। কিন্তু জল কোথায়? শোনো নি ঢেঁড়া দিয়ে কি বলে গেছে কালকে?

—কি বলে গেছে?

—কয়লার অভাবে বয়লার চলছে না, জল পাম্প হচ্ছেনা, তাই সহরে দু-একদিন এখন জল দেওয়া যাবে না।

বটে, বটে। অফিসেও শুনেছিলাম সেই কথা। আমারি উচিত ছিল, বাড়ীতে সে কথা আগে থাকতে বলে দেওয়া। তা না আমাকেই সেটা স্মরণ করিয়ে দিতে হল গৃহিণীর! হবে না, যে খাটুনী পড়েছে আজকাল। যাই হক রান্নাবান্নার জন্যে জল পেলেন কোথায়, গৃহিণীকে সেটা জিজ্ঞাসা করা দরকার। বললাম, তোমার কি ব্যবস্থা হল? বললেন, ভোরবেলা গোপুকে সঙ্গে করে গিয়ে কালী গঙ্গায় একটা ডুব দিয়ে এলাম। তারপর বাসনাকে বললাম, টিউবওয়েল থেকে জল ধরে দিতে ক' ঘড়া। মাগী এত বজ্জাত, দু'আনা পয়সা নিলে এজন্যে!

—আহা তা নিকগে। কম কষ্ট হয় হ্যাচাং হ্যাচাং করে জল তুলতে!

গৃহিণী আর কিছু না বলে, তেলের বাটিটি নামিয়ে দিয়ে চলে গেলেন। নাকে ও কানে খানিকটা তেল দিয়ে, এক খাবল তেল মাথায় বুলাতে বুলাতে ছুটলাম গঙ্গামুখো।

ফিরে এসে দেখি ছোট বোন মেন্তি বসে আছে—কাছাকাছিই থাকে ওরা। যখন-তখন আসে। বললাম, কি রে মেনি, এ সময়ে যে? রান্নাবান্না নেই?

মুখে আঙুল দিয়ে মেন্তি চুপ করতে ইঙ্গিত করলো, তারপর কাছে সরে এসে বললো, লক্ষ্মীটি ছোড়দা, দুটি কয়লা দাও আজকের মতো, রান্না চড়াতে পারছি না। বৌদিকে বলতে পারি নি লজ্জায়।

অবাক হয়ে বললাম, কয়লা? কয়লা কোথায়? তোর বৌদি ত ব্রহ্মাণ্ড কেটে উনুনে দিচ্ছে সকাল থেকে। আমার ঘরে ত এক কুচি কয়লা নেই।

মুখ চুণ করে মেন্তি বললো, তোমার ভগ্নিপতি ত রেগেমেগেই আগুন! আমি কি করবো বলো ত? ক'দিন চালালাম মেজদিদির

বাড়ী থেকে চেয়ে চিন্তে—তাদেরও কাল থেকে কয়লা নেই। বললাম, কি করি বল ভাই? আচ্ছা দেখছি আমি, কিছু করতে পারি কিনা—ও বেলা দোবখন খবর তোকে।

ভাত খেতে বসে দেখি উনুনের পাশে এক গাদা মাসিকপত্র জড়ো করা রয়েছে। আইবুড়ো বয়সে কবিতা লেখার বদ-অভ্যাস ছিল—'সহচর' বলে একটা পত্রিকায় বেরিয়েছিল অনেক রচনা। সেইগুলো আজ কয়লা-সঙ্কটে উনুনজাত হচ্ছে। এবার আত্মসম্বরণ করা কঠিন হল। বললাম, আচ্ছা তুমি কি পাগল হলে? আমার রচনাগুলো···

গিন্নীও প্রস্তুত ছিলেন। বাঘের মতো হুঙ্কার দিয়ে বললেন, কাব্যি! আগে ভাত তারপর ত কাব্যি। বাড়াবাড়ি রেখে দাও। লজ্জা করে না বুড়ো বয়সে ও সব ঢং করতে?

তা বটে। ঘাড় হেঁট করে ভাত উঠাতে লাগলাম! ইতিমধ্যে ছোট ভাই অশ্বিনী ম্লান মুখে এসে দাঁড়ালো দরজার কাছে। বললাম, কি রে অশ্বিনী, এত শীগ্রী ফিরলি যে?

মুখ কাঁচুমুচু করে বললে অশ্বিনী, পনেরো দিনের মতো মিল বন্ধ হয়ে গেল ছোড়দা—কয়লার জন্যে।

—অ্যাঁ? মাইনে দেবে ত?

—তা দেবে কেন? No work no pay যে আমাদের। রেশনও দেবে না বললে।

এবার আঁৎকে উঠলাম। বিয়াল্লিশ টাকা চালের দাম বাজারে। নিজে পাই মোটে আট সের অফিস থেকে—অশ্বিনী আনছিল এক মণ করে কণ্ট্রোল রেটে, তাতেই চলছিল এতদিন। এখন কি হবে? বললাম, সর্ব্বনাশ, না খেয়ে মরতে হবে যে!

গিন্নী বললেন, হকগে। উনুন ধরানোর দায় থেকে ত আমি অব্যাহতি পাবো।

উপেক্ষিত রবিবার

একান্ত অপ্রত্যাশিত ভাবেই দেবুদের আড্ডাটা ভেঙে গেল। নিরঞ্জন আর সন্তোষ প্রায় এক সঙ্গেই আসা বন্ধ করে দিলে, দেবুরও ও বিষয়ে আর বড় বেশী উৎসাহ দেখা গেল না। এ রকমটা কিন্তু হবার কথা নয়। ছেলেবেলা থেকেই ওরা তিনজন পরস্পরের বন্ধু, এক সঙ্গে পড়েছে, একত্রে খেলাধুলো করেছে। বলতে গেলে এক আড্ডাতেই মানুষ ওরা। ব্যাপারটা কি বাইরে থেকে বোঝার উপায় নেই, তাই পাড়ার লোক এ নিয়ে কানাঘুষো করে—ওরা নিজেরা কিন্তু হুঁসই করে না সেদিকে। হয়ত টেরও পায় না।

সেদিন দেবুর জন্মতিথি উৎসবে এসেছে নিরঞ্জন আর সন্তোষ, একটু দূরবর্ত্তী বন্ধুরাও এসেছে কেউ কেউ। আহারাদির পর্ব্ব মিটে যাবার পর আলগা লোকেরা যখন একে একে বিদায় হল, দেবু ওদের দু'জনকে নিয়ে তে-তলার লাইব্রেরী ঘরে এসে বসলো। বসলো ত বসলো—কথাও নেই, বার্ত্তাও নেই, হাতের সিগারেট হাতেই জ্বলে যাচ্ছে, টানার উৎসাহ নেই কারুর।

অবশেষে নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে দেবুই বললে, দেখ, আমরা পরস্পর থেকে ক্রমেই যেন দূরে সরে যাচ্ছি। অথচ কিছুই ত হয় নি আমাদের মধ্যে!

সন্তোষ বললে, আমিও ত তাই ভাবি।

নিরঞ্জন বেশী কথা বলে না। সে শুধু বললে, সত্যি।

দু-মিনিট দম ধরে থেকে দেবু বললে, আমাদের তিনজনেরই জীবনে নিশ্চয় এমন কোন প্রব্লেম এসেছে, যা মারাত্মক রকম পার্সন্যাল, আর

তা আমরা গোপন করতে চাইছি বলেই এই বিপত্তি হয়েছে—কেমন কি না?

সন্তোষ আস্তে করে টেবিলে একটা চাপড় মেরে বললে, রাইট। নিরঞ্জন শুধু নীরব স্বীকৃতিতে মাথা নাড়লো।

ঠিক হল, নিজের নিজের এই মারাত্মক ব্যাপারটা প্রত্যেককেই খুলে বলতে হবে এবং এখনি, নইলে এই অদৃশ্য ব্যবধান কিছুতেই ভরাট হবে না। কিন্তু কে আগে বলবে? দেবুই অগ্রসর হল।

সে বললে, দেখ, আমি প্রেমে পড়েছি—মেয়েটির নাম সুষমা, কাছেই থাকে। অল্প দিন হল আলাপ হয়েছে। রূপে-গুণে একেবারে যাকে বলে ইনকম্পেয়ারেবল! তাকে যদি না পাই, তা হলে স্রেফ মারা পড়বো। দিনরাত্রি আমি ডুবে আছি তারি ধ্যানে, দিস লাইফ ইজনট ওয়ার্থ টাপেন্স উইদাউট হার।

সন্তোষ বললে, আমারও ব্যাপার হুবহু ঐ। আর মজা এই যে তারও নাম সুষমা।

নিরঞ্জন জুল জুল করে তাকাচ্ছিল। সে বললে, তাহলে দেখা যাচ্ছে, সুষমা দুটো নয়, তিনটে। মজা মন্দ নয় ত! লাকি থ্রি মাস্কেটিয়ার্স!

দেবু হৈ-হৈ চেচিয়ে উঠলো, সপ্লেনডিড! এ যেন আমাদের তিন জনের বন্ধুত্বকে একতার সূত্রে বাঁধার জন্যে বিধাতারই স্বহস্ত-প্রসারিত একটি প্ল্যান্! গড্ বী উইথ আস্—কি বলিস?

কিন্তু আনন্দ উল্লাস সবই ঝিমিয়ে পড়লো দু-মিনিটে, যখন জানা গেল যে সুষমা তিনটি নয়, মাত্র একটি এবং আনন্দকুমারী বালিকা বিদ্যালয়ের থার্ড টিচার সুষমা হোড়কেই তিনজনে ভালোবেসেছে। তিনজনেই হালফিল পরিচিত হয়েছে তার সঙ্গে এবং সন্ধ্যার ঝোঁকে তার গ্রোভ লেনের বাসায় গিয়ে সাড়ম্বরে চা খেয়ে ও কম্যুনিজম

ব্যাখ্যা করে এসেছে। কারুর সঙ্গে কারুর সরেজমিনে সাক্ষাৎ হয় নি—এটাই আশ্চর্য্য!

ভরা দুপুরেও তিনজনের চোখে ঘনিয়ে নামলো অমাবস্যার অন্ধকার। ঈর্ষা, না বেদনা, না হতাশা···কি জাগলো ওদের মনে কে বলতে পারে? নিষ্প্রাণ জড়পিণ্ডের মতো যে যার চেয়ার আঁকড়ে রইলো—পারলে ডাক ছেড়ে কাঁদা, না পারলে ঘাড়-মুখ গুঁজে পড়ে থাকা···এ ছাড়া আর কিবা করার আছে? এমন কাণ্ড কখনো শুনেছে কেউ?

দেবুই প্রথম কথা কইলে। সে বললে, যাকগে ভাই, ভবিতব্যের বিধান! কিন্তু আমাদের বন্ধুত্বটা ক্ষুণ্ণ হবে এ জন্যে—এ আমরা চাই না। আবার স্বয়মার আশা ছাড়াও আমাদের পক্ষে কঠিন, উই মাষ্ট ষ্ট্রেণ এভ্রি নার্ভ টু উইন্ হার গ্রেস্। এখন উপায় কি?

নিরঞ্জন কথা কমই বলে। সে বললে, ইউ বেটার ফাইণ্ড দ্য ওয়ে আউট।

সন্তোষ বললে, এই একটা প্ল্যান বাৎলা না, যাতে দুদিকই বজায় থাকে। আমরা সেটা মেনে নোব।

দেবুর মাথায় মতলব আসে চটপট। খানিকটা ভেবে নিয়ে সে বললে, হয়েছে। স্বয়মা ত আমাদের তিনজনাকেই তার ইভনিংটা দিতে রাজী আছে—ধর, আমরা তিনজনেই যদি রেগুলার দু'দিন করে সপ্তাহে তার ওখানে যাই, তাহলে সপ্তাহের ছ'দিনই আমরা তাকে এনগেজ করে রাখতে পারবো, আর প্রত্যেকেই আপন আপন কেস ভালো করে পুট-আপ করতে পারবো। তাছাড়া আর একটা সুবিধা হবে এতে—অন্য লোকের আর মাথা গলানোর চান্স থাকবে না।

সন্তোষ বললে, ভেরী ওয়েল। নিরঞ্জনও মাথা নাড়লে।

দেবু তখন বললে, কিন্তু এখানে আমাদের গোটা দুই প্রিন্সিপল ঠিক করে নিতে হবে, যা আমরা কোনো রকমেই লঙ্ঘন করবো না—আমরা

নিজের নিজের কেস যেমন করে পারি ক্যারি করবো, কিন্তু এমনভাবেই করবো, যেন আই অ্যাম মনার্ক অব অল আই সার্ভে—আমাদের জানা-শোনার বা বন্ধুত্বের কথা সুষমার কাছে ঘুণাক্ষরেও প্রকাশ পাবে না, তাহলেই আর এন্টি-ক্যানভাসেরও ভয় থাকবে না কারুর।

সন্তোষ বললে, অল রাইট। কিন্তু আর একটা?

বলছি, দেবু বললে, আর একটা হচ্ছে, আমরা একে অন্যের তারিখে কোন কারণেই গিয়ে উঠবো না। ঠিক দু-দু'দিন, আর সপ্তাহে একটা দিন থাকবে সুষমার নিজের জন্যে। সেই দিনটা সে করবে নিজের অনুযায়ী ভাবা-চিন্তা ও হিসাব-নিকাশ।

সন্তোষ বললে, এগ্রিড। এরপর যেরো যদি একজন কৃতকার্য হয়?

দেবু মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বললে, সঙ্গে সঙ্গে আর দু'জন রেস্পেক্টি-ফুলি ব্যাক-আউট করবে। সেটুকু শিভালি আমাদের চাই বৈকি। কিন্তু তার আগে পর্যন্ত আমাদের মধ্যে সুষমা-প্রসঙ্গ উঠবেই না ওবকমে, যদিও আমাদের ভেতর দেখাশোনা এবং আদান-প্রদান চলবে ঠিক আগের মতোই।

দু'জনেই রাজী হয়ে চলে গেল।

* * * *

সোম-মঙ্গল দেবুর, বুধ-বিষ্যুৎ সন্তোষের, শুক্র-শনি নিরঞ্জনের আর সুষমার নিজের জন্যে রবিবারটা। পালাক্রমে চলতে লাগলো ওদের আনাগোনা, উদ্যোগ-আয়োজন, আবেদন-নিবেদন। কেউ কারুর কথা জানে না, জানতে চায় না, জানায়ও না। কিন্তু প্রত্যেকেরই মুখের ভাব চোখের দৃষ্টি ও চলার ধরণে মনে হয়, সাফল্য বুঝি তারি সুনিশ্চিত।

মাসখানেক পরের এক রবিবারে একত্র হয়েছে তারা। তিনজনেরই কিন্তু হয়েছে অভূতপূর্ব পরিবর্ত্তন—দৃষ্টি নিষ্প্রভ, গতি শ্লথ, ভঙ্গী নির্জ্জীব। অভ্যাস মতো একত্র হয়েছে তারা—এক-এক পেয়ালা চা এবং একটি করে

সিগারেটও নিয়ে বসেছে, কিন্তু ঐ পর্যন্ত। অটল নিস্তব্ধতায় গুম হয়ে রয়েছে তিনজনই।

হঠাৎ গলাটা একটু ঝেড়ে নিয়ে দেবু বললে, ভাই, আজ আমার ডিক্লেয়ার করার দিন।

সন্তোষ আর নিরঞ্জন তড়াক করে উঠে দাঁড়িয়ে বিবর্ণমুখে বললে, কি, সাক্সেস?

হতাশায় ভেঙে পড়ে দেবু বললে, না রে না, ড্যাম ফেলিওর।

পকেট থেকে দেবু বের করলে একখানা লেফাফা—তার ভেতর থেকে টেনে তুললে একখানা গোলাপী লেটার-পেপারে লেখা চিঠি এবং গড় গড় করে পড়তে আরম্ভ করলে—

প্রিয় দেবেন্দ্রবাবু,

আপনার বন্ধুত্বকে আমি চিরদিন শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করিব। আপনি সত্যই একজন অমায়িক বন্ধু ও বুদ্ধিমান ভদ্রলোক। আমাকে বন্ধুত্বের উপহারস্বরূপ এ পর্যন্ত অনেক কিছুই দিয়াছেন, যাহা আমার পরবর্তী জীবনে বিশেষ কাজে আসিবে। আগামী ১৭ই জুলাই তারিখে আমি শ্রীযুক্ত ···· কে বেধ পতিরূপে গ্রহণ করিতেছি। ঐ দিবস আপনার কিন্তু আসা চাই-ই, কারণ তাহার পর আর কোন দিন আমাদের দেখা-সাক্ষাৎ হইবে কি না তাহার কোনই নিশ্চয়তা নাই। ইতি—

বিনীতা

সুষমা হোড়।

নিঃশব্দে সন্তোষ এবং নিরঞ্জনও পকেট থেকে বের করলে অনুরূপ দু'খানি খাম—আগাগোড়া এই চিঠি, শুধু দেবেন্দ্রবাবুর জায়গায় সন্তোষবাবু এবং নিরঞ্জনবাবু। আর নিরঞ্জনের চিঠিতে একটা পুনশ্চ—আমি স্কুলের 'কাজ ছাড়িয়া দিয়া আজই এ বাসা হইতে উঠিয়া যাইতেছি। বিবাহের ঠিক আগেই আপনাকে আমার নূতন ঠিকানা জানাইয়া পত্র দিব।

দেবু সজোরে একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললে, আমি ভেবেছিলাম, বুঝি তোদেরই কারুকে···এখন দেখছি, দেয়ার ওয়াজ সাম্ আদার ডগ্ !

নিরঞ্জন বললে, ভালোই হল এক রকম। চিঠিটা পেয়ে অবধি কেবলি মনে হয়েছে আমার, হয় তুই, নয় সন্তোষ, দাঁও মেরে দিলি। সত্যি বলছি তোকে, ভীষণ যন্ত্রণা বোধ করেছি তাতে, এক ফোঁটাও শিভালি জাগেনি মনে।

দেবু অন্যমনস্কের মতো বললে, ঐ যে রবিবারটা ফাঁক রেখেছিলাম, ঐ দিয়েই ঢুকেছে এসে কোন ব্যাটা রাহু। ড্যাম্ ফুল উই আর— আমাদের উচিত ছিল ঐ দিনটা তিনজনেরই এক সঙ্গে যাওয়া, আর সুধীকে সপ্তাহ ভোর কড়া পাহারায় রাখা।

সন্তোষ মাথা চুলকে বললে, কিন্তু আমাদের কি হেভি ড্রেনেজ হয়েছে ভাব ত ঐ চীজকে হস্তগত করার জন্যে! আমার ত প্রায় দশ হাজার মতো গেছে। বিনিময়ে কি পেয়েছি? নট্ ইভন্ এ ড্যাম লিটল কিস্!

হিসাব বাকী দু'জনেরও ঐ রকমই, আর নালিশও প্রায় একই। তবু তিনজনেরই মুখে ফুটে উঠলো কেমন একটা অনির্ব্বচনীয় স্বস্তির স্নিগ্ধতা। ওদের তিনজনের কেউ ত জিততে পারে নি! বন্ধুত্বটা ঠিক রইলো।

দেবু বললে, কুছ পরোয়া নেই। লেট দ্যা ডেভিল বী হ্যাপি। একটু দম নিয়ে বললে, আসছে ভাইসরয় কাপে টাকাটা তুলে নিতেই হবে, যে করে হক—কি বল?

নিরঞ্জন শুধু ঘাড় নাড়লে, সন্তোষ বললে, সিওর!

আর এক পিঠ

[মায়া সম্প্রতি ফিরেছে প্রসূতি হাসপাতাল থেকে। বারান্দায় একটা ইজি চেয়ারে বসে আছে প্রবীর, আর মায়া তারি পাশে একটা মোড়ায় বসে লেস বুনছে। বড় ছেলে বিশু দম-দেওয়া মোটরকার নিয়ে এক মনে খেলায় ব্যস্ত। বেলা তখন প্রায় দুটো আন্দাজ হবে।]

মায়া। ইস, এমন ভয় হয়েছিল আমার যখন ডাঃ চৌধুরী বললেন ফরসেপ দিতে হবে। কি মনে হচ্ছিল জানো?

প্রবীর। কি মায়া?

মায়া। খালি মনে হচ্ছিল, এক্ষুণি মরে যাবো—আর তোমার সঙ্গে দেখা হবে না। তুমি তখন অফিসে, খবরও পেতে না। আচ্ছা খুব কাঁদতে ত?

প্রবীর। জানো না মায়া? আমার কি আছে তুমি, আর এই বাচ্চা দুটো ছাড়া?

মায়া। সত্যি? তা জানো সুষমা কিন্তু ভারী ভালো মেয়ে। কি যত্নই করেছে আমার দিনরাত। ও না থাকলে হয়ত আমি এত শীগ্রী সেরে উঠতে পারতাম না। বেচারীর জীবনটা ভারী দুঃখের—এত কষ্ট হয় শুনলে!

প্রবীর। তোমাকে বুঝি বলেছে সব?

মায়া। হ্যাঁ গো। ওর মা হলেন বামুনের মেয়ে—বারো বছর বয়সে বিধবা হয়ে, থাকতেন এক দূর সম্পর্কের মামার বাড়ীতে। যখন বয়স সতেরো-আঠারো, সে সময় ভাব হয় এক ফিরিঙ্গী সাহেবের সঙ্গে। বিয়ে ত আর হতে পারেনা—তাই শেষটা পালিয়ে গেলেন। বছর তিনেক এক

সঙ্গে ছিলেন—সেই সময় সুষমা হয়। তার পর সাহেব কোথায় পালালো। সুষমার যখন বছর দুই বয়স, তখন তাকে মিশন হোমে পাঠিয়ে ওর মা···

প্রবীর। আর একটি মক্কেল জুটিয়ে নিলেন?

মায়া। না গো না—আত্মহত্যা করলেন। সুষমা ভাগ্যিস মিশন হোমে গিয়েছিল, তাই একটু লেখাপড়া শিখে নার্স হতে পেরেছে।

প্রবীর। আর সেই সঙ্গে মায়ের ব্যবসাটাও ধরতে পেরেছে!

মায়া। ছি-ছি কি যে বলো তার ঠিক নেই! ও সে রকম মেয়েই নয়। আমার সঙ্গে ওর সব কথাই হয়েছে—কে একটি বিয়ে-ওলা লোক নাকি বৌকে হাসপাতালে রাখতে এসে ওর প্রেমে পড়ে যায়—ওকে খুব দামী একটা নেকলেস দেয়, আর বলে, বিয়ে করতেও রাজী। কিন্তু সুষমা শুধু বৌটার মুখ চেয়েই রাজি হতে পারেনি—নইলে লোকটিকে ও কম ভালোবাসেনি!

প্রবীর। হবে। হ্যাঁ, নেকলেসের কথায় মনে পড়ে গেল। তোমার নেকলেসটা মায়া ক'দিনের জন্যে একটু দীনবন্ধু বাবুকে দিয়েছি—উনি ঐ প্যাটার্ণের একটা নেকলেস গড়াবেন মেয়ের জন্যে। তুমি ত বাড়ী ছিলে না...

মায়া। মেয়ে? দীনবন্ধু বাবুর আবার মেয়ে এলো কোথা থেকে? ওঁর ত তিনটি ছেলে!

প্রবীর। ভাইঝি, ভাইঝি। ঐ মেয়েই আর কি! হ্যাঁ, তা তোমার সুষমার প্রেমিকটি ভাগলো শেষ পর্য্যন্ত!

মায়া। বলেছে ত তাই। কি রকম লোক দেখো ত! বৌ আছে, পাঁচ বছরের একটা ছেলে আছে, আর একটা হতে গেছে—সেই লোক কি না গিয়েছে আবার প্রেম করতে। মাগো পুরুষমানুষরা সব পারে।

প্রবীর। সবাই পারে?

মায়া। কি জানি বাপু! তুমি যদি ও রকম করতে তাহলে আমি কিন্তু ঠিক বিষ খেয়ে মরতাম। সত্যি বলছি!

প্রবীর। কেন? যাকে এত ভালোবসো, তাকে খুসী করবার জন্যে এটুকু ত্যাগ করতে পারতে না?

মায়া। রক্ষে করো, আর সব পারি ওখানে ভাগ দিতে পারি না। স্বার্থপর বলো, বলতে পারো।

প্রবীর। কিন্তু সুষমা ত আর একটা বৌ আছে জেনেই...

মায়া। সুষমা যে বোঝে, তার রূপের কাছে কেউ দাঁড়াতে পারবে না, দু'দিনেই সে অজগরের মতো স্বামীকে টেনে নেবে। সত্যি অদ্ভুত রূপ, না? আর গুণও কম নয়! এমন মন-কেমন করে আমার বেচারীর জন্যে!

প্রবীর। বেশ ত! তাহলে নিজের কাছেই এনে রাখো না ওকে।

মায়া। সর্ব্বনাশ! তাহলে দু'দিন পরে আমাকেই বিদেয় হতে হবে। তুমি এখন কেমন আছো,—তখন কি আর ঐ রূপের সামনে আমাকে মনে ধরবে?

প্রবীর। হুঁ। তা তোমার সুষমার প্রেমিকটি করেন কি?

মায়া। তোমাদেরই ব্যবসা—উকিল। সুষমা বলেছে, আমাকে তার ছবি দেখাবে—নাকি খুব সুন্দর দেখতে!

প্রবীর। দেখো মায়া, ভুলে যেয়ো না যে তুমি একজন ভদ্রমহিলা। একটা হাসপাতালের নার্স—তার কাছে উপকার পেয়েছো, কৃতজ্ঞ থাকো। কিন্তু অত ঘনিষ্ঠতায় কাজ কি তার সঙ্গে? তার ল্যভার কি প্যারামার, একটা কে কোথাকার লোকার, তার ছবি তুমি দেখতে যাবে কি জন্যে?

মায়া। না, ও বলেছিল, তাই বলছি।

প্রবীর। না, ওসব বিশ্রী ব্যাপার ভালো নয় মায়া। আমি পছন্দ করি না।

মায়া। ওমা তুমি রাগ করলে!

প্রবীর। রাগের কথা হলেই রাগ করে লোকে।

[প্রবীর উঠে গিয়ে জানালার কাছে খবরের কাগজটা নিয়ে বসলো। চাকর দীনবন্ধু ইতিমধ্যে একটা প্যাকেট এনে দিলে মায়ার হাতে। খুলতেই বেরুলো, একটি নেকলেস, আর একখানি ফটোগ্রাফ। মায়া উঠে এলো প্রবীরের কাছে।]

মায়া। তুমি? তুমি?

প্রবীর। কি? কি?

মায়া। এ কার নেকলেস? কার ছবি? এত বড় বিশ্বাসঘাতক, এমন নির্লজ্জ তুমি! আমি তোমায় এত উঁচু ভেবেছি—আর তলায় তলায় তুমি আমার সঙ্গে এই রকম শয়তানী করেছো।

প্রবীর। আহা হা মায়া, ব্যাপারটা তুমি আগে বুঝতে চেষ্টা করো।

মায়া। চুপ করো তুমি। কোন কথা শুনতে চাইনে তোমার। দু'জনে গলা ধরাধরি করে বসে ছবি তোলানো হয়েছে, নিজে হাতে তার গায়ে লেখা হয়েছে, 'আদরের সুষমাকে—প্রবীর'—এর ভেতর বোঝাবুঝির কি আছে? ন্যাকামি পেয়েছো—না?

প্রবীর। তুমি সমস্তটাই ভুল বুঝছো মায়া।

মায়া। ঠিকটা তাহলে কি, শুনি?

প্রবীর। পরে বলবো। এই টুকু শুধু জেনে রাখো যে যা ভেবেছো মোটেই তা নয়। লক্ষ্মীটি মায়া, মাথা গরম করো না ভুল করে।

মায়া। এই রইলো তোমার ঘরবাড়ী, সংসার—আমি আজই চলে যাচ্ছি গোপালপুরে। নৃপেন মজুমদার এখনো হাল ছাড়েনি—এই সেদিনও হাসপাতালে এসেছিল দেখা করতে। তুমি যদি আমার সঙ্গে নেমকহারামি করতে পেরে থাকো ত আমিই বা তা পারবো না কেন?

প্রবীর। খুন করবো, নেপাকে আমি খুন করে ফেলবো।

মায়া। জেলে যেতে হবে তাহলে। আচ্ছা, এই পর্য্যন্তই। আমার গয়নাগাটি, জিনিষপত্র, সব আমি নিয়ে চললাম, ছেলে দুটোকেও নিয়ে চললাম সেই সঙ্গে। রইলে তুমি, আর রইলো তোমার সুষমা।

প্রবীর। দয়া করো মায়া, দয়া করো। আমার কেউ নেই তুমি ছাড়া।

বন-বেড়াল

[বালাগঞ্জের একটি সমৃদ্ধ গৃহস্থের বাড়ী। ফুলবাগানের সংলগ্ন বারান্দায় দাঁড়িয়ে চুরুট মুখে রায় বাহাদুর শশী দত্ত—সামনে জটাজুটধারী সন্ন্যাসী আত্মানন্দ স্বামী। পূজার অব্যবহিত পূর্ব্বের এক সকাল।]

রায় বাহাদুর। হাঁ৷ তুমি—আপনি, আপনি কে?

আত্মানন্দ। আমি? কেউ না—পথিক।

রায় বাহাদুর। বেশ, তা পথ থাকতে ঘরে কেন?

আত্মানন্দ। সবই তার লীলা। তিনি পথও সৃষ্টি করেছেন, আবার সেই পথের বাঁকে বাঁকে ঘরও বসিয়েছেন। যখন যেখান থেকে ডাক আসে...

রায় বাহাদুর। খুব ভালো কথা। কিন্তু নিজের ঘর ছেড়ে, পরের ঘরে চড়াও করার বুদ্ধিটা কেন, শুনতে পাই কি?

আত্মানন্দ। যতদিন নিজেকে নিয়ে পড়েছিলাম, ততদিনই ছিল আত্ম-পর। যখনি তাঁর হাতে সঁপে দিলাম নিজেকে, তখনি সমস্ত দুনিয়া আপন হয়ে গেল।

রায় বাহাদুর। বুঝলাম। তা শোনো বাবাজী, দুনিয়া কথাটা শুনতে ছোট, হলেও জিনিষটা খুব ছোট নয়। চেষ্টা করলে, কোথাও না কোথাও দিব্যি আসর জাঁকিয়ে বসতে পারবে তুমি। ঢের আহম্মক আছে, যারা মনে করে, যোগেযাগে একবার তোমাদের কাছাটা ধরতে পারলেই এক হেঁচকা টানে সরাসরি বৈকুণ্ঠে গিয়ে উঠবে। তারাই তোমাদের মতো বুজরুকদের গুরু বানিয়ে ··

আত্মানন্দ। অর্থাৎ···

রায় বাহাদুর। অর্থাৎ সোজা বাংলায়, তোমায় পত্রপাঠ এখান থেকে বিদায় নিতে হবে। যদি ভালোয় ভালোয় না যাও, তাহলে তার জন্যে অন্য ব্যবস্থা করতে হবে আমাকে।

আত্মানন্দ। কিন্তু আপনার পুত্র ও পুত্রবধূ আমার মন্ত্র-শিষ্য—আর পৌত্রী আমার···

রায় বাহাদুর। তাই নাকি? ক-দিন বাড়ী ছিলাম না, এর মধ্যেই এত কাণ্ড হয়ে গেছে! আচ্ছা করছি তার ব্যবস্থা। কিন্তু তুমি বাছা আর দেরী করো না। চটপট সরে পড়ে, ত তল্পিতল্পা গুটিয়ে!

আত্মানন্দ। ওঁদের সঙ্গে দেখা না করে ত আমি যেতে পারি না গুরু হিসাবে আমারও ত একটা কর্ত্তব্য আছে।

রায়বাহাদুর। ওঃ আচ্ছা। এই বাসুদেব, বৌমাকে ডাক ত একবার শীগ্গী।

আত্মানন্দ। আর শ্রীমানকেও।

রায় বাহাদুর। কিচ্ছু দরকার নেই, কান এলে তার সঙ্গে মাথা আপনিই আসবে।

[মিলির প্রবেশ]

মিলি। কি বলছেন বাবা? কফি তৈরি করেছিলাম আপনার জন্যে।

রায় বাহাদুর। ফকির চেয়ে ফকিনের দরকারই আমার বোধ হয় বেশী হয়ে উঠেছে বৌমা। এই কৃষ্ণাবতারটিকে রাতারাতি বাড়ীর ভেতর বহাল করার স্বাধীনতা তোমাদের কে দিলে শুনি ?

আত্মানন্দ। বলো মা, বলো। ক্ষোভের কিছু নেই। অধ্যাত্ম-জিজ্ঞাসার প্রথমাবস্থায় প্রতিকূলতাই প্রত্যাশিত। আমি আশা করছি, অচিরেই ওকেও আমার শিষ্য শ্রেণীভুক্ত করতে পারেবো।

রায় বাহাদুর। দেখা যাবে বাবাজীর বৈরাগ্যের দৌড়টা। কিন্তু আমি যা জিজ্ঞাসা করছিলাম···

মিলি। ভেতরে আসুন বলছি।

আত্মানন্দ। আচ্ছা, আমিই না হয় তফাতে যাচ্ছি মা---এখনো কীর্তনটা বাকি রয়েছে, সেটা সেরে নিয়ে তারপর স্নানে মনোনিবেশ করবো। [প্রস্থান]

মিলি। উনি একজন সিদ্ধ পুরুষ। মস্ত বড় জমিদারের ছেলে—সন্ন্যাস নিয়ে বেরিয়ে এসেছেন।

রায় বাহাদুর। যেহেতু অন্যভাবে অন্নসমস্যার সুষ্ঠু সমাধান হচ্ছিল না! কিন্তু তোমরা ঐ চীজটি জোটালে কোত্থেকে ?

মিলি। মাঝখানে কি হয়েছিল বলি আপনাকে বাবা। আপনি ত ছিলেন না—হঠাৎ খুকু একদিন আমাকে বললে—সে নাকি ঈশান মাষ্টারকে ভালোবাসে। শুনে আমি ত লজ্জায় মরে যাই! বললাম, সে কি রে? এত বড় বাড়ীর মেয়ে তুই, এত লেখাপড়া শিখেছিস, তুই কি না শেষকালে একটা চালচুলোহীন প্রাইভেট মাষ্টারকে বিয়ে করবি? মেয়ের সেই ভীষ্মের পণ! উনি ত শুনে রেগেই আগুন, দিলেন সেদিনই ঈশানকে বিদায় করে। মেয়ে খাওয়া-দাওয়া ছেড়ে দিলে।

রায় বাহাদুর। ননসেন্স! ওবয়সে ওরকম হয়ই। কিন্তু এই গেরুয়া-পরা গণ্ডারটা এলো কি করে তার ভেতর?

মিলি। বলছি বাবা। মেয়ের ভাব-গতিক দেখে উনি ভয়নাক মনের কষ্টে ছিলেন—সেই সময় একদিন মিঃ মজুমদারের বাড়ীতে হল বাবার সঙ্গে দেখা। আশ্চর্য্য যে বাবা ওকে দেখেই টপাটপ করে নাম-ধাম সব বলে দিলেন—এমন কি মেয়ের কাণ্ড কারখানা পর্য্যন্ত।

রায় বাহাদুর। আর তাতেই তোমরা একেবারে হাড়গোড় ভেঙে গড়িয়ে পড়লে বাবার শ্রীচরণে···না?

মিলি। মেয়ের মন থেকে ঐ পাপ দূর করার আর ত কোন উপায় ছিল না বাবা! আপনি দেখলে অবাক হয়ে যাবেন, উনি ক'দিনের মধ্যেই খুকুকে একেবারে অন্য মানুষ করে দিয়েছেন—দিনরাত্রি পূজো-আচ্চা, গীতা-পাঠ, আর গান-কীর্ত্তন নিয়েই মেতে আছে সে।

রায় বাহাদুর। সর্ব্বনাশ করেছো আর কি মেয়েটার। এর চেয়ে ইডিয়ট ঈশান মাষ্টারের সঙ্গে বিয়ে হলেও ওর মঙ্গল হত—ঈশান আর যাই হক ভদ্রসন্তান ত, লেখাপড়াও ভালোই জানে। যাকগে, এখনো শোধরাও মেয়েকে, নইলে কিন্তু···

মিলি। না বাবা, ধর্ম্মের পথে যাচ্ছে মেয়ে—মা-বাবা হয়ে কি আমরা তাতে বাধা দিতে পারি কখনো?

[উত্তেজিত ভাবে নৃপেনের প্রবেশ]

নৃপেন। মিলি, শীগ্‌গীর এসো ত একবার···

মিলি। কেন, কেন? কি হয়েছে?

নৃপেন। খুকুকে কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না···ঘরে না, ছাদে না, বাথরুমে না। কালীর মা'র মুখে শুনে আমি সারা বাড়ী তোলপাড় করে এলাম···এখন উপায়?

মিলি। সে কি? সকাল বেলা ত কোথাও যাবার কথা নয়। যায়ও না ত কোনদিন! গাড়ী আছে ত গ্যারেজে?

নৃপেন। তা বোধ হয় আছে।

রায়বাহাদুর। ধর্ম্ম-চর্চ্চার ফলটা তাহলে হাতে-হাতেই ফলে গেছে, অ্যাঁ? তা সেই দাড়িয়ালাটা গেল কোথায়? শীগ্গী আটকাও সেটাকে —সে-ই নির্ঘাত আছে এর ভেতর। বাসুদেব!

নৃপেন। বাবা যেন কি! মহাপুরুষকে হাতে পেয়ে অপমান করার মতো মহাপাপ আর নেই। সেই ঈশান ব্যাটাই তলায়-তলায় একটা কিছু করেছে।

রায় বাহাদুর। আরে হ্যাঁ—তাই ত বলছি আমি। তা বাসুদেব, কোথায় গেলিরে হারামজাদা!

[বাসুদেবের প্রবেশ]

বাসুদেব। গাড়ী ত রয়েছে বাবু, লোকনাথ নেই। তার কাঠের বাক্সটাও উধাও হয়েছে গ্যারাজ থেকে!

মিলি। যা তুই এখান থেকে।

রায় বাহাদুর। হ্যাঁ যা তুই, আর যাবার পথে স্বামীজীর ঘরে ছেকল তুলে দিয়ে যাস। যেন না পালায়।

নৃপেন। বাসু…

রায় বাহাদুর। খবদ্দার! যা, শীগ্গী, ছেকল তুলে দিগে।

[বাসুদেবের প্রস্থান]

মিলি। হায়, হায়, আমি কোথায় যাবো গো! শেষটা ড্রাইভারের সঙ্গে পালালো! ছি ছি এমন মেয়েও হয়েছিল আমার পেটে গো! এর চেয়ে যে ঈশান মাষ্টারও ভালো ছিল গো!

রায় বাহাদুর। সেই ঈশানই তোমার ঘাড় ভেঙেছে গো—আর মরা-কান্না কেঁদে কি হবে গো!

নৃপেন। একটা ডায়েরি করে আসবো পুলিশে?

রায়বাহাদুর। কিছু করতে হবে না—ঐ বিটলেটাকে ধরে আনো এখানে, আমিই ব্যবস্থা করে দিচ্ছি সব।

[সক্রোধে আত্মানন্দের প্রবেশ]

আত্মানন্দ। নৃপেন্দ্র, আমি কি তোমার ভৃত্যের হাতে লাঞ্ছিত হতে এসেছি এখানে? সে কি না আমায় ঘরে তালা দিয়ে রাখতে চায়!

নৃপেন। বাপু…

রায় বাহাদুর। চুপ…হ্যাঁ, এদিকে এসো ত তুমি। আমার নাৎনী কোথায়, বলো শীগ্রী।

আত্মানন্দ। ব্যস্ত হবেন না। আত্মিক শক্তি প্রভাবে আমি সবই জানতে পেরেছি—গত রাত্রি প্রায় সাড়ে এগারোটার সময় তিনি কশ্চিৎ কৃষ্ণবর্ণ মধ্যবয়স্ক ব্যক্তির সঙ্গে গৃহ থেকে বেরিয়ে গেছেন এবং তার অল্প পরেই এক গৌরাঙ্গ ভদ্রবংশজাত শিক্ষিত যুবকের সঙ্গে তাঁর পরিণয় হয়েছে—এই সহরেরই কোন সমৃদ্ধ পল্লীর এক ত্রিতল নিভৃত গৃহে।

নৃপেন। বিয়ে হয়েছে…অ্যাঁ! প্রভুর দৃষ্টি ত মিথ্যে হবার নয়। মিলি, তাহলে নিশ্চয় ঈশানই লোকনাথকে ঘুষ দিয়ে…

রায়বাহাদুর। নিশ্চয়। হারামজাদা শ্বশুর কোথাকার! বের কর কোথায় রেখেছিস খুকুকে, নইলে এখুনি জুতিয়ে…।

নৃপেন। আঃ বাবা! ঈশান ত আর সামনে নেই যে…

[রায় বাহাদুর। তড়াক করে উঠেই আত্মানন্দের দাড়ি ধরে দিলেন এক টান—সঙ্গে সঙ্গে কৃত্রিম চুলদাড়ি খসে গেল। লোকটা আর কেউ নয়, স্বয়ং ঈশান।]

মিলি। অ্যাঁ?

নৃপেন। বাবা ত ঠিকই ধরেছেন। দাঁড়াও, সায়েস্তা করছি তোমায়।

রায় বাহাদুর। চুপ কর নেপা, জামাইয়ের সঙ্গে বুঝি ঐ রকম করে কথা বলে কেউ?

আত্মানন্দ। দাদামশায়, আমি গোড়াতেই বুঝছিলাম তোমার

দয়ার শরীর। আমায় তুমি রক্ষা করো, ওঁরা নিশ্চয় আমাকে পুলিশে দেবার চেষ্টা করবেন।

রায় বাহাদুর। ভয় নেই রে শালা, তোকেই আমি পুলিশের চাকরি দোব বরং একটা। কিন্তু সে শালীকে লুকিয়ে রেখেছিস কোথায়?

আত্মানন্দ। এই বাড়ীতেই। তেতলার চিলে কোঠায় আছেন। ভোরের মুখেই দু-জনে চলে এসেছি বিয়ে সেরে। তিনি আগে এসেছেন, তারপর আমি।

রায়বাহাদুর। লোকনাথ কোথায় গেল? তাকে একটা মোটা বখশিস দিতে হবে দেখছি!

আত্মানন্দ। লোকনাথ? বখশিস?

রায় বাহাদুর। হ্যাঁ রে শালা, তোর গোয়েন্দা লোকনাথ। তার কাছেই ত সব জানতে পেলাম ভোরবেলা। সে হাতে না থাকলে কি আর এত সহজে চোর ধরতে পারতাম? তা আর কি, যা তুইও তেতলায়, সে শালী হয়ত মরছে একা একা পেট ফুলে।

[আত্মানন্দের প্রস্থান]

নৃপেন। বাবা এ বিয়েতে তোমার মত আছে?

রায় বাহাদুর। আমাদের মতামতের অপেক্ষা রেখেছে নাকি ওরা? এখন ভালো মানুষের মতো হিন্দুমতে একটি অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করে ফেলো গে, তাহলেই সব দিক রক্ষা হবে।

মিলি। একটা কোথাকার কে!

রায় বাহাদুর। ওরে বেটী, জামাই করতে হলে এর চেয়ে ভালো পাত্র আর পেতিস কোথায়? বুদ্ধিটা ত দেখলিই। বিদ্যেও কম নেই—কেম্ব্রিজের স্কলার। মেয়ে পড়াতে পড়াতে প্রেমে পড়ার তালে ছিল, সুযোগ বুঝেই খুকু লম্বা কাঁটায় গেঁথে তুলেছে শালাকে!

নৃপেন। রক্ষে হক বাবা!

মিলি। ভাগ্যিস আর কিছু বলে বসো নি তুমি! যাহক খুকুর কপালের জোর আছে! বলতো বটে সকলেই, ওর ভালো বিয়ে হবে।

রায় বাহাদুর। খুকুর কপালের চেয়ে ও শালার বুদ্ধির জোরটাই বেশী, নইলে কি আর ঐ বন-বেড়াল এত সহজে বাঘের নাৎনীকে বের করে নিয়ে যেতে পারতো তার খোঁয়াড় থেকে? ঐ যে এদিকেই আসছেন তু-জনে। আসুন, আসুন, আসতে আজ্ঞা হক! ওরে কে আছিস, উলু দে, উলু দে।

নৃপেন। বাবার কাণ্ড! চলো মিলি, আমরা সরে পড়ি এখান থেকে।